দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

আপিল বিভাগের রায় হাসিনার ঘুম কেড়ে নিয়েছে
পৃঃ ১৪

দুর্নীতিগ্রস্ত ও দেশবিরোধীদের মহাজোট
পৃঃ ২২

৭০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।। ১৮ ভাদ্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

মোদী-বিরোধী জোট সার্কাস

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৮ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৪ সেপ্টেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

স্মরণে ▯ ৯

সারা দেশে সিপিএম সাইনবোর্ডে পরিণত হয়ছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

তিন তালাক অসাংবিধানিক, অবৈধ : সুপ্রীম কোর্ট, অনড় মৌলবাদীরা ▯ পরমেশ্বর রায় ▯ ১২

আপিল বিভাগের রায় হাসিনার ঘুম কেড়ে নিয়েছে ▯ ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ▯ ১৪

আচার্য রাধাকৃষ্ণান ভারত-আত্মার এক মহান রাষ্ট্রদূত ▯ তুষারকান্তি ঘোষ ▯ ১৬

মমতা নিজেও জানেন মহাজোটের কোনো আশা নেই ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৯

দুর্নীতিগ্রস্ত ও দেশবিরোধীদের মহাজোট ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২২

প্যাটেলের জয়ে কংগ্রেসের নিরাশা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা নেই ▯ নলিন মেহতা ▯ ২৭

বাংলার লোকদেবী : সেলেটের বিশালাক্ষ্মী ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ৩১

উস্‌গালীমলের প্রস্তর ভাস্কর্য ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ৩২

সার্ধশতবর্ষে কৃষ্ণলাল বসাক ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩৩

অভিনন্দন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩৪

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : মাসি তুমিই আমার ফাঁসির কারণ ▯ ৩৫

স্বাস্থ্য : রোগ উপশমে রসুন ▯ শুভ্রা মল্লিক ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** ▯

অন্যরকম : ৩৮ ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের ১২৫ বর্ষ

ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষত তাঁর শিকাগো ভাষণ একটা মাইল ফলক। বর্তমান ভারতেও হিন্দু জাতীয় চেতনা জাগরণে এই ভাষণটি সমান প্রাসঙ্গিক। বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি সংরক্ষণযোগ্য।

লিখেছেন : স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, ড. রাকেশ দাশ, কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-তে সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে।
দাম ১০.০০ টাকা। সত্ত্বর কপি বুক করুন।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

ডোকলাম : ভারতের কূটনৈতিক জয়

ডোকলামে আড়াই মাসেরও বেশি সময়ের অচলাবস্থা নিরসনে ভারত ও চীন সম্মত হওয়ায় কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা ভারতের এক বিশেষ সাফল্য হিসাবে গণ্য হইতে পারে। ভারত বরাবরই বলিয়াছে কূটনৈতিক স্তরেই সমস্যা সমাধান সম্ভব। সীমান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে এই ভাবেই পরস্পরের অভিমতের প্রতি সম্মান জানাইলে সমাধান সম্ভব। চীনে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগদানের আগে সীমান্তে অচলাবস্থার অবসান ঘটাইতে ভারত সক্ষম হইল। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু যে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি হইল তাহা নয়, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যে কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সক্ষম এমন একজন নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হইল। চীনে অনুষ্ঠিতব্য ব্রিকস সম্মেলনে তিনি মাথা উঁচু করিয়াই যাইবেন। ভারত ধৈর্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি সংযম এবং দৃঢ়তাও প্রদর্শন করিয়াছে। আর এই কারণেই চীন নমনীয় হইতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য চীন যে ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিবে না তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। চীনের নিকট হইতে ইহার বেশি আশা করাও যায় না। দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়া অনুসারে ভারত ডোকলাম হইতে সেনা প্রত্যাহার করিবে, অপরদিকে চীন সড়ক তৈরির কাজ বন্ধ রাখিবে। দুই দেশের বোঝাপড়া লইয়া চীনের এই ব্যাখ্যায় বোঝা যায় যে ডোকলামে তাহাদের সেনা থাকিবে, কেননা সেখানে আগেও সেনা মোতায়েন ছিল। ভারতের আপত্তি শুধু এইখানেই ছিল যে চীন ডোকলামে সড়ক নির্মাণের কাজ বন্ধ করুক।

এই ধরনের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি নিজেদের দাবিগুলিকে সঠিক বলিয়া মনে করে আর এই উপলব্ধিই সমাধানের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকে। তাই চীনের বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো। বাস্তব স্থিতি হইল ভারত যাহা চাহিয়াছে চীন তাহা মানিয়া লইয়াছে। আর এই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল, চীন প্রথম হইতেই এমন ব্যবহার করিতেছিল যে ভারত তাহার কাছে কিছু নয়, ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। চীন বরাবরই দাবি করিয়া আসিতেছিল ডোকলাম বিবাদের নিষ্পত্তি তাহাদের শর্তেই করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় নাই। যদিও চীন ভারতকে হুমকি দিয়াই চলিয়াছে। চীন আন্তর্জাতিক চুক্তিকে নিজেদের মতো করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে এবং সেইসঙ্গে ইতিহাসকেও। এত কিছুর পরেও ভারত কূটনৈতিক মর্যাদার সীমা উল্লঙ্ঘন করে নাই। শেষ পর্যন্ত চীন হাস্যাস্পদ কিছু কুযুক্তির অবতারণা করিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেরাই পড়িয়াছে।

চীনের এই নির্লজ্জ ব্যবহারের মোকাবিলায় ভারতের এইরূপ দৃঢ় অটল মনোভাব প্রদর্শন বিশ্ব, বিশেষত এশিয়ার দেশগুলির নিকট ছিল দুর্লভ কিন্তু সুখের। ভারতীয় নেতৃত্ব অন্তত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে ইহা ১৯৬২ সাল নয়। চীনের ক্ষেত্রে ভারতের এই কূটনৈতিক জয় প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দেশগুলির কাছেও একটি বার্তা দিতে সক্ষম হইবে। পেশি প্রদর্শন করিয়াও চীন যে শেষ পর্যন্ত এক পা পিছাইয়া যাইল, তাহাতে সাধারণ ভারতবাসীও উজ্জীবিত বোধ করিতেছে। ১৯৬২-র হতাশার স্মৃতি ভুলিয়া দেশ এখন চীনের মোকাবিলা করিতে পারে—এই আত্মবিশ্বাসে সাধারণ ভারতবাসী বলীয়ান হইবে। এতসবের পরেও চীনের সম্পর্কে দেশবাসীকে সদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

সুভাষিতম্

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তুতে ভারত ভূমি ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।।

দেবগণ এইরূপ গান করে থাকেন যে ভারতভূমি সত্যিই ধন্য, দেবতারা স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের জন্য ভারত ভূমিতে দেবত্ব ত্যাগ করে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন।

মোদী সরকারের কূটনৈতিক সাফল্য

ডোকলাম নিয়ে পিছু হটলো চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অবশেষে পিছু হটলো চীন। গত ২৮ আগস্ট নয়াদিল্লি জানিয়েছে যে ভারত-চীন উভয়পক্ষই দ্রুততার সঙ্গে ডোকলাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে রাজি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক একইসঙ্গে জানিয়েছে দু'টি দেশ কূটনৈতিক সংযোগ রক্ষা করতে সম্মত হয়েছে এবং তাদের মত, আগ্রহ ও উদ্বেগও বিনিময় করতে তারা প্রস্তুত। ডোকলামে সেনা-প্রত্যাহার নিয়ে চীন বিগত বেশ কিছুদিন ধরে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে আসছে; কখনো তাদের সরকারি মুখপত্র, কখনো বা চীনের সরকারি আধিকারিকেরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছিলেন। পক্ষান্তরে ভারত ডোকলামে চীনা সেনার চোখে চোখ রেখে চলার পাশাপাশি কূটনৈতিক দৌত্যের পথেও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই চীনের এই পশ্চাদপসরণ নরেন্দ্র মোদী সরকারের কূটনৈতিক জয় হিসেবেই দেখছেন কূটনীতিজ্ঞরা।

চীনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র হু চানিং বেজিংয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন— চীনা সেনারা নাকি 'গ্রাউন্ড লেভেল'-এ তদন্ত করে দেখেছে ভারত তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ভারত সরাসরি চীনের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে চীন সেনা না সরালে ভারতের সেনা সরানোর প্রশ্ন আসে না। কূটনীতিকরাও মনে করেন মুখরক্ষার্থে এখন ভারতের সেনা প্রত্যাহারের গল্প ফাঁদছে চীন।

আসলে ডোকলাম নিয়ে তাদের হুঙ্কারে নিজেরাই বিপদে পড়ে চীন। আন্তর্জাতিক মহলে এনিয়ে ভারতের সহনশীলতার পাশাপাশি চীনের প্ররোচনামূলক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করা হয়। একই সঙ্গে চীনের দোসর পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মদতদাতা, তা স্পষ্ট হয়ে যায় আন্তর্জাতিক মহলের সামনে। চীনের সক্রিয় সাহায্যেই পাকিস্তানের এই বাড়বাড়ন্ত, এমনই অভিযোগে আমেরিকা-সহ ইউরোপের অধিকাংশ দেশ সরব হয়। অন্যদিকে চীনের বরাবরের ভরসা এদেশের কমিউনিস্টরা ক্রমশ মুছে যাওয়ায় ভারতে চীনা দ্রব্য বয়কটের প্রচার ও স্বদেশপ্রেমী মনোভাব বৃদ্ধি পায়। যার ফলে চীন আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার দুর্বল হলেই ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সামরিক ক্ষেত্র সবেতেই চীনের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শত ষড়যন্ত্র করেও সে গুড়ে যখন বালি পড়লো, প্রত্যক্ষ- পরোক্ষভাবে চীনের সহায়ক এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব-সংকট অনুভব করেই চীন পিছু হটল বলে রাজনীতিবিদদের একাংশের অনুমান। তথ্যাভিজ্ঞমহলের এও অনুমান, আগামী ৩-৫ সেপ্টেম্বরে চীনের জিয়ামেনে ব্রিকস সম্মেলনে ভারত-চীন ছাড়াও ব্রাজিল, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা অংশ নেবে। উপস্থিত থাকার কথা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদীরও। সেখানে ডোকলাম নিয়ে চীনের অকূটনৈতিক ও প্ররোচনামূলক পদক্ষেপের সমালোচনায় ঝড় উঠতে পারে অনুমান করেই চীন পিছু হটলো বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত-মালদ্বীপের সম্পর্ক ২০০০ বছরের পুরনো : নাসিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মালদ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ২০০০ থেকে ৩০০০ বছরের পুরানো। তাই চীনের হয়ে মালদ্বীপপুঞ্জ ওকালতি করবে এটা হতে পারে না। সম্প্রতি মালাদ্বীপপুঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি মহম্মদ নাসিদ একথা বলেছেন। দি রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ফর ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে তিনি দিল্লিতে এসেছেন। চীন 'ওয়ান বেল্ট অ্যান্ড ওয়ান রোড' তৈরিতে যে উদ্যোগ নিয়েছে, মালাদ্বীপপুঞ্জকে সেই পরিকল্পনায় শামিল করতে চায়। কিন্তু ভারতের স্বার্থের বিনিময়ে মালাদ্বীপপুঞ্জ তা করবে না বলে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন মহম্মদ নাসিদ।

দেশের নতুন ৩০ কোটি পরিবার জনধন প্রকল্পের আওতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানালেন অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে সমস্ত রেকর্ড চূর্ণ করে ৩০ কোটি পরিবার তিন বছর আগে চালু হওয়া 'জনধন প্রকল্পের' মাধ্যমে উপকৃত হতে শুরু করেছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি নজিরবিহীন অর্থনৈতিক অগ্রগমন। ৩০ কোটি সংখ্যাটা বিশ্বের বহু দেশের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের সাফল্যের জন্য তিনি অত্যন্ত পরিপূর্ণতা অনুভব করছেন কেননা সমাজের প্রান্তবাসী মানুষটিও এখন অর্থনীতির মূল স্রোতে যোগ দিতে পারছে। এই ঘটনা সরকারের তিন বছর পূর্তির মধ্যেই সম্ভব হওয়া মোটেই কম কথা নয়।

তাঁর মাসিক 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান— 'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার (পিএমজেডিওয়াই) অধীনে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ৬৫ হাজার কোটি টাকা জমা রয়েছে। এই অর্থের পুরোটাই এ যাবৎ ব্যাঙ্কে পৌঁছতে না পারা দেশের দরিদ্রতম মানুষের টাকা। পক্ষান্তরে এটি তাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়। এই সূত্রে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন পিএমজেডিওয়াই সূচনা মাত্র এর মাধ্যমে জেএএম (জনধন, আধার, মোবাইল) —তিনটি জিনিসই এক সূত্রে বাঁধা পড়বে। এর ফলে অর্থনৈতিক বিপ্লবের রাস্তা খুলে যাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি সদ্য চালু হওয়া জিএসটির উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে যেমন দেশব্যাপী একটি ট্যাক্স, একটিই বাজারের সূত্রে সারা ভারত আবদ্ধ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনই পিএমজেডিওয়াই ও জেএএম বিপ্লবের মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি সর্বসাধারণের জন্য সমান অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল পরিসর তৈরি হয়ে যাবে। কোনো ভারতবাসীই আর মূলধারার বাইরে থাকবে না। মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়ামের বিশেষ প্রশংসা করে জেটলি বলেন, এই জেএএম-র ভাবনা তাঁরই (অরবিন্দ) মস্তিষ্ক প্রসূত যার ফলে অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণের সঙ্গে সঙ্গে বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন (আধার) ও মোবাইল টেলিকম্যুনিকেশন একই সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে জেটলির ঘোষণা পিএমজেডিওয়াই-এর অধীন অ্যাকাউন্টগুলিতে শূন্য ব্যালেন্স থাকার সংখ্যা ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে ৭৬.৮১ থেকে কমে ২০১৭-এর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি ২১.৪১ হয়েছে। ৪০টি প্রথম সারির ব্যাঙ্ক ও আরআরবি (রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কগুলির) দেয় তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালের মার্চ অবধি মহিলাদের অংশীদারী ৪০ শতাংশ। মহিলাদের মোট ৪৩.৬৫ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে পিএমজেডিওয়াই-এর অধীনে খোলা হয়েছে ১৪.৪৯ কোটি খাতা। একই সঙ্গে জেএএম-এর মাধ্যমে এই বিপুল পরিবর্তনের ফলে সরকার সামগ্রিক অর্থনীতি ও গরিব মানুষেরা একই সঙ্গে উপকৃত হচ্ছে। গরিবের আওত্তাধীন হচ্ছে বহু অর্থনৈতিক প্রকল্প। সঙ্গে অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাও মিলছে। এই প্রকল্পের সাফল্যের ফলে সরকারের অন্যান্য অনুদানের বোঝাও অনেক কমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের অ্যাকাউন্টগুলিতে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ও অপব্যয়হীন পদ্ধতিতে তাদের প্রাপ্য পৌঁছেছে। জেটলি বলেন যে সেদিন আর দূরে নয় যখন একশো কোটি আধার কার্ড, একশো কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে একশো কোটি মোবাইল নাম্বারও যুক্ত হবে। তখনই গোটা ভারত অর্থনীতি ও যন্ত্রগণকের (ডিজিটাল) মূল পরিসরের মধ্যে ঢুকে যাবে।

জমিয়ত উলেমা হিন্দের মন্দির সেবা, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২২টি মন্দির ও ২টি মসজিদকে পুনরায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্য মূল ধারার মুসলমান সংগঠন জমিয়ত উলেমা হিন্দের (জে ইউ এইচ) ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সূত্রে জমিয়তের স্বেচ্ছাসেবকরা যে দেশের মধ্যে একটি অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ রাখল তা উল্লেখ করে মোদী বলেন, বিশেষ করে দেশে মহাত্মা গান্ধীর ২ অক্টোবর জন্মবার্ষিকী পালন সূত্রে ২০দিন ধরে 'স্বচ্ছতাই সেবা' শীর্ষক যে প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে তাতে এই কাজ নিশ্চিত প্রেরণা জোগাবে। চলতি মাসের মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, গুজরাটের বনস্কান্তা জেলার ধনেরা অঞ্চলে তাঁর নিজের শহরকে জমিয়তের স্বেচ্ছাসেবকরা সেবার জন্য বেছে নেয়। গুজরাটে বিধ্বংসী বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর চর্তুদিকে ঘন কাদার আস্তরণ দেখা যায়। স্বেচ্ছাসেবকরা এই কাদা অপসারণ করার কঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পিছপা হয়নি। এই ঘটনাকে মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী আসন্ন গান্ধী জয়ন্তীর প্রাক্কালে এন জি ও থেকে শুরু করে বিদ্যালয়, কলেজের প্রধান, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নেতা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পঞ্চায়েত প্রধানদেরও এই স্বচ্ছতা অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলেন যাতে একটি পরিচ্ছন্নতার বাতাবরণ সকলে অনুভব করতে পারে। এই সূত্রে মোদী তাঁর সরকারে আসীন হওয়ার সময়কার দেশের ৩৯ শতাংশ অংশ শৌচালয়ের আওতাধীন থাকা থেকে বর্তমান ৬৭ শতাংশে পৌঁছনোর কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই বিশেষ 'স্বচ্ছতা হি সেবা' প্রচারে সাড়া দিয়ে দেশের স্যানিটেশন সচিব পরমেশ্বরন আইয়ার চটজলদি জানিয়ে দেন তাঁরা এই ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে বিশেষভাবে সমন্বয় রেখে চলবেন যাতে স্বচ্ছতার লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়।

শ্রী শিবভগবান বাগাড়িয়া একজন আদর্শ স্বয়ংসেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ আগস্ট ২০১৭, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ ও বলিষ্ঠ কার্যকর্তা শ্রী শিবভগবানজী বাগাড়িয়া, তাঁর ৮৯ বছরের (জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) দীর্ঘ ও বিশাল কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেছেন আর সেইসঙ্গে রেখে গেছেন কিছু অবিস্মরণীয় স্মৃতি যা আমাদের কাছে চিরন্তন পাথেয় স্বরূপ।

শাখাই যে সঙ্ঘ সাধনার মূল উৎসকেন্দ্র, তারই জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল তাঁর জীবন। নিত্য শাখা ছিল তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। তাই সন্তান বিয়োগের ব্যথাও তাঁকে বিরত করতে পারেনি শাখায় উপস্থিত হওয়া থেকে। সন্তানের দাহকার্য সম্পন্ন করে পরের দিন শাখায় আসার এক অনন্যসাধারণ নজির তিনি স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন যা ঘটার তা ঘটে গেছে, কিন্তু তার জন্য সাধনার কাজ বন্ধ হবে কেন; আর তা তিনি একদিনের জন্য বন্ধ হতে দেননি। তাই দুর্ঘটনায় পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ায় তিনি যখন দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন, নিজের গাড়িতে ধ্বজ ও ধ্বজদণ্ড সঙ্ঘস্থানে পাঠিয়ে দিতেন যাতে শাখা একদিনের জন্য বন্ধ না হয়। এমনকী কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর যখন তিনি হাঁটতে শুরু করেন তখন ক্রাচ্ এবং গাড়িতে চেয়ার নিয়ে সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হয়েছেন। শারীরিক সক্ষমতা যতদিন ছিল তিনি নিজে গণ (troop) নিতেন, দণ্ডের বিভিন্ন প্রয়োগ নিখুঁতভাবে শেখাতেন। গীত হলে বাকী স্বয়ংসেবকদের গীত কণ্ঠস্থ করাতেন, সুর তোলাতেন। তিনি শাখায় একা সাধারণত আসতেন না, আসার পথে যেসব স্বয়ংসেবকদের বাড়ি পড়ত, তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। নিয়মিত শাখায় যাঁরা আসতেন, কেউ একদিন না এলেই তাঁর খবর নিতেন, পারলে বাড়ি চলে যেতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকে তিনি সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হতে না পারলেও, বাড়ি-সংলগ্ন একটি খোলা জায়গায় শাখা করে গেছেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার পর পরিশেষে দক্ষিণবঙ্গের প্রান্তীয় ও পরে পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় ব্যবস্থা প্রমুখের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ

করেন। কিন্তু তিনি নিজেকে কখনই শুধুমাত্র শাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। একজন আদর্শ স্বয়ংসেবক সমাজ গঠনের জন্য সামাজিক স্তরের কোনো না কোনো ভূমিকা পালন করবেন। পরম পূজনীয় ডাক্তারজীর এই ভাবনাকেও তিনি বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনে একাধিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে।

তাই গোমাতা সেবা ও গোমাতা সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা পিঁজরাপোল সোসাইটির মতো সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্ব রক্ষা যখন গভীরভাবে সঙ্কটাপন্ন হয়েছে, তখন সমাজের আহ্বানেই তিনি সেই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ৩১ বছর সম্পাদক এবং পরে পাঁচ বছর অধ্যক্ষের পদে আসীন থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাকে পুনরুদ্ধার করে সার্বিকভাবে তার শ্রীবৃদ্ধি করেন। কুমার সভা পুস্তকালয় এবং বড়বাজার লাইব্রেরির মতো প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থাগুলিকেও সঠিক মার্গদর্শন এবং সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে সজীব করে তুলেছিলেন। বড়বাজার লাইব্রেরির অবস্থা এতটাই করুণ হয়ে উঠেছিল যে শেষে বই বিক্রি করে ওই সংস্থার কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতে হোত। এছাড়াও যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হলো আজ যে প্রান্তীয় কার্যালয় রূপে কেশব ভবনকে দেখছি, তার প্রতিষ্ঠার পেছনেও সর্বপ্রথম তিনিই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই সম্ভব হয়েছিল এই ভবনের স্থাপনা।

শুধুমাত্র সঙ্ঘের কাজেই নয়; নিজস্ব কর্মজীবনেও তিনি এক স্বতঃপ্রোণদিত উদ্যোগপতি হিসেবেও তাঁর পদচিহ্ন রেখে গেছেন। তাই কোনো পৈতৃক বিষয় উত্তরাধিকার সূত্রে না পেয়েও তিনি একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিজের প্রচেষ্টায় গঠন করে গেছেন— যেমন ভারতী তৈল উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড, কে বি মোটর্স প্রাইভেট লিমিটেড, রাজকুমার ব্রাদার্স ইত্যাদি। একজন প্রবুদ্ধ চিন্তক ও সমাজের প্রাণপুরুষ হয়ে সঙ্ঘময় নিষ্কাম কর্মযোগী রূপে তিনি চিরকাল আমাদের সামনে প্রেরণাদায়ী শক্তি রূপেই বিরাজ করবেন— আর সেই জন্যই তিনি তাঁর জীবনসঙ্গী করে নিয়েছিলেন কবি অতুলপ্রসাদের সেই বিখ্যাত গীতটিকে। যেটি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়—

আপন কাজে অচল হলে
চলবে না রে চলবে না,
অলস স্মৃতি-গানে
তাঁর আসন টলবে না রে টলবে না।।...

এই ভাবেই চিরভাস্বরময় বিশাল কর্মময় জীবনের সমাপ্তিলগ্নে তিনি রেখে দিয়ে গেছেন চার পুত্র, চার কন্যা, পুত্রবধূ-জামাতা-সহ বহু আত্মীয়-পরিজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী।

বিদেশে প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ৮০ হাজার ভারতীয়ের মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত তিন বছরে বিদেশে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ৮০ হাজার ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে এনেছে বিদেশমন্ত্রক। সম্প্রতি একথা জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদেশমন্ত্রকের চরিত্রই পাল্টে গেছে। পরিবর্তনের নমুনা পেশ করে তিনি বলেন, '২০১৪ সালে সারা দেশে মাত্র ৭৭টি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র ছিল। গত ছ'মাসে ২৩৫টি নতুন সেবাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।' বিদেশমন্ত্রকের রাজ্য পর্যায়ের কার্যালয় বিদেশ ভবনের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের রাজধানী শহর মুম্বাইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স হাউসে চালু হওয়া বিদেশ ভবনের অধীনে থাকবে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বিদেশযাত্রীদের সুরক্ষাকেন্দ্র, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারিয়েট এবং আই সি সি আর-এর আঞ্চলিক কার্যালয়। বিদেশ ভবন স্থাপনের প্রকল্পকে 'পাইলট প্রোজেক্ট' আখ্যা দিয়ে সুষমা স্বরাজ জানান, প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানী শহরে বিদেশ ভবন স্থাপন করার কথা ভাবছে মন্ত্রক। তিনি বলেন, 'যেসব ভারতীয় বিদেশে যাবেন বলে ভাবছেন আমরা তাদের কাউন্সেলিং করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যে দেশে তারা যাবেন সেই দেশের আইনকানুন সম্বন্ধে আমরা মানুষকে সচেতন করে তুলতে চাই। ভুয়ো কর্মসংস্থান সংস্থা সম্বন্ধেও তাদের সজাগ করে দিতে চাই।'

বেড়ে গেল ডোকা লা আউটপোস্টের গুরুত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ডোকলাম থেকে সরে গেলেও ডোকা লা আউটপোস্টে নজরদারি বাড়াবে ভারতীয় সেনা। এখান থেকে ডোকলাম মালভূমিতে চীনের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডোকালাম মালভূমি ভুটানের অন্তর্গত এবং চীনের সীমান্ত এখান থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে। ভারতের সেনাসূত্র থেকে বলা হয়েছে, 'আমাদের সৈন্যরা এখন পাহাড়ের চূড়োয় অবস্থান করছে। এটা এমন একটা জায়গা যেখান থেকে প্রয়োজনে খুব সহজেই ডোকলামে পৌঁছে যাওয়া যায়। ঠিক এই ভাবেই আমরা জুন মাসে গিয়েছিলাম। চীন যদি আবার ডোকলামে রাস্তাঘাট তৈরি করে কিংবা এমন কিছু করে যা ভারতের নিরাপত্তার পরিপন্থী তাহলে আবার আমাদের সৈন্য ডোকলামে ঢুকবে।'

সেনা কর্তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভারত কোনওভাবেই চীনকে জামফেরি অঞ্চলে মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করতে দেবে না। কারণ এই অঞ্চল 'সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই স্পর্শকাতর'। এখান থেকে শিলিগুড়ি করিডোর এবং 'চিকেনস নেক' খুবই কাছে। একবার যদি চীনা সৈন্য ডোকলামের দখল নেয় তাহলে ভারতের পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ক্ষেত্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডোকলামে চীন সাঁজোয়া বাহিনী এবং বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী-সহ ১৫,০০০ সৈন্য মোতায়েন করেছিল। জবাবে ভারতও সমসংখ্যক সৈন্যের বাহিনী প্রস্তুত রেখে প্রতিরোধ করেছে ৭০ দিন ধরে।

উবাচ

"ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় আইনসভার অধিকারের উপর দখলদারি।"

মুকুল রোহতগি
প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল

ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের স্বীকৃতি দেওয়া প্রসঙ্গে

"আমি এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে ভারতের মতো কোনও দেশ এত উদ্বাস্তু/অভিবাসী গ্রহণ করেনি। সুতরাং ইউএনএইচসিআর বা অন্য কোনও সংগঠনের আমাদের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে আমার বা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলার অধিকার নেই।"

কিরণ রিজিজু
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অন্যত্র পাঠানো প্রসঙ্গে

"আমরা খোলাখুলিই স্বীকার করছি, যদি কর সংক্রান্ত কোনও বিষয় (যা নিয়ে বিতর্ক) থাকে, তাহলে বিষয়টা জিএসটি কাউন্সিলে পাঠাবো।"

অর্জুন রাম মেঘওয়াল
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

NAREDCO পরিচালিত সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে

"আমাদের সীমান্তের এলাকাগুলিতে এমন কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেব না যা অন্য এলাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।"

নির্মলা সীতারামন
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী

এক সাক্ষাৎকারে

"সে বন্য পশুর মতো আচরণ করেছে। তাকে ক্ষমা করার কোনও প্রশ্নই নেই।"

জগদীপ সিংহ
স্পেশাল সিবিআই জজ

গুরমিত রাম রহিমের শাস্তি প্রসঙ্গে

সারা দেশে সিপিএম সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে

একটা কথা আর গোপন নেই। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম এখন পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক দল। আলিমুদ্দিনের পার্টি অফিসে বৃদ্ধ অসুস্থ দুই নেতা বিমান বসু আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছাড়া দ্বিতীয় কোনও নেতাকে প্রতিদিন পার্টি অফিসে দেখা যায় না। সাংবাদিক বৈঠক না ডাকলে রিপোর্টাররাও যান না। অথচ বামফ্রন্ট যখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল তখন কলকাতার সাংবাদিকদের আবশ্যিক কাজ ছিল বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আলিমুদ্দিনের পার্টি অফিসে হাজিরা দেওয়া। রাজত্ব চলে যাওয়ার পর আর কেউ যায় না। পার্টির মুখপত্র গণশক্তি এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে দলীয় মুখপত্রটির পাঠক নেই বললেই চলে। পার্টি অফিসের পাহারাদার দুই বৃদ্ধ কমরেড ছাড়া আর কেউ পড়েন বলে মনে হয় না। যেভাবে পার্টি আর তার মুখপত্র চলছে তাতে বোঝা যাচ্ছে লালবাতি জ্বালিয়ে তালা ঝোলাবার সময় হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছেন যে তাঁর প্রস্তাবিত বিজেপি বিরোধী মহাজোটে সিপিএমকে শরিক করবেন না। কারণ, সিপিএম ভণ্ড ও প্রতারক। বাংলা ও বাঙালির মহাসর্বনাশ করেছে। নেত্রীর রাজনীতিকে সমর্থন না করলেও বলতে হবে এই একটা কথা তিনি ঠিক বলেছেন। সিপিএম বা মার্কসবাদীরা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও বাস্তবে তারা চায় পার্টির একনায়কতন্ত্র। চীনে বা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তে নিষ্ঠুরতম নিপীড়ন চলেছে সাধারণ মানুষের উপরে। সারা বিশ্ব দেখেছে কমিউনিস্টদের এলিট নেতাদের সামন্ততান্ত্রিক যথেচ্ছাচার। শোষণের এক নির্মম চেহারা। শুধু বামপন্থী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এইসব কথা বললে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অবজ্ঞার সুরে বলবেন, এসব পাতি বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচার। গোরক্ষকরা খুন করলে সেটা অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু ছত্তিশগড়ে মাওবাদীরা খুন করলে সেটা বিপ্লবী সংগ্রাম। আমেরিকার কোরিয়া-ভিয়েতনাম যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, আফগানিস্তান আক্রমণ করলে সেটা সমর্থনযোগ্য কাজ। চীনে পঞ্চাশের দশকে ভ্রান্ত বামপন্থী নীতির ফলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষে কয়েক

গূঢ়পুরুষের কলম

কোটি মানুষ স্রেফ অনাহারে মারা যান। এটা লাল চীনের ইতিহাস। গোপন কথা নয়। কিন্তু ঝোলা কাঁধে বামপন্থীরা বলবেন, এসব অপপ্রচার । কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর চীনে স্বর্গরাজ্য চলছে। বাঙালি কমরেডদের এইসব দ্বিচারিতার না আছে যুক্তি, না আছে মানবাধিকার রক্ষার প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার। আছে শুধু কিছু শেখানো বুলির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। টিয়া পাখিকে রাম নাম বলা শেখানো যায়। কিন্তু পাখি তার অর্থ বোঝে না। সে না বুঝেই বুলি আউড়ে তারিফ পায়।

আমার সুপরিচিত অনুজ সাংবাদিক অঞ্জন বসু তাঁর সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন বামেরা বিজেপি বিরোধী মহাজোটে থাকে কী করে? কারণ, ওই মহাজোটের বড় শরিক কংগ্রেস দল। যে কংগ্রেসের ছায়া পর্যন্ত মাড়ানো যাবে না বলে ফতোয়া দিয়েছে কেরলের কারাট শিবির। অথচ রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের সময় কংগ্রেস প্রার্থী মীরা কুমারকে ভোট দিয়েছেন বামপন্থীরা। এখানে বামপন্থী বলতে আমি সিপিএমকে বোঝাতে চাইছি। স্বাভাবিকভাবে অঞ্জনবাবু প্রশ্ন তুলেছেন যে সিপিএমের কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু কংগ্রেসের ভোট নিয়ে সীতারাম ইয়েচুরিকে রাজ্যসভায় পাঠানো যায় না। কেন? উত্তর নেই এই দ্বিচারিতার। আসলে বামপন্থীরা বা কমিউনিস্টরা ধান্দাবাজির রাজনীতি করে। যেখানে টাকার গন্ধ আছে সেখানেই আপনারা কমিউনিস্টদের উপস্থিতি দেখবেন। ২০০৪ সালে সিপিএম কংগ্রেসের মনমোহন সিংহ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল মনমোহন সিংহকে ব্ল্যাকমেল করে মোটা টাকা কামিয়ে নেওয়া। কিন্তু ২০০৮ সালে বাম ব্ল্যাকমেলারদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মনমোহন সিংহ সিপিএমের আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি করেন। বঙ্গজ কমিউনিস্টদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশ কারাট শিবিরের চাপে সিপিএম কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয়। তার খেসারত দেশজুড়ে সিপিএম দিচ্ছে। বাংলার সিপিএম এবং কেরলের সিপিএম নেতাদের কথাবার্তা শুনলে মনে হচ্ছে তারা যেন পরস্পরের শত্রু রাজনৈতিক দল। নেতৃত্বের এই লড়াইতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন দলের নিচুতলার কর্মীরা। তাঁরা মনে করেন তৃণমূল সিপিএমের প্রধান শত্রু। বিজেপি নয়। তাই তৃণমূলের অত্যাচার দাদাগিরি রুখতে তাঁরা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন। অবশ্যই এটা আমার ব্যক্তিগত মত।

যেভাবে রাঁচিতে লালু-মমতার মহাজোট ফ্লপ করেছে তাতে মনে হচ্ছে ২০১৯ সালে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল সব কটি আসনেই প্রার্থী দেবে। বড় জোর নীচের তলায় স্থানীয়ভাবে কয়েকটি আসনে বোঝাপড়া হতে পারে। তবে কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধীর কড়া নির্দেশে শেষপর্যন্ত কংগ্রেস এবং তৃণমূল জোটবদ্ধভাবে লড়ে তবে লাভবান হবে বিজেপি। কংগ্রেস ভোটদাতারা কখনই তৃণমূল অথবা সিপিএমকে ভোট দেবেন না। তাঁরা নিশ্চিতভাবে বিজেপিকে চুপচাপ পদ্মে ছাপ দেবেন। ■

তালাক দিলেন না দিদি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

পর পর দু' সপ্তাহে আপনাদের চিঠি লিখলাম। কিছু মনে করবেন না প্লিজ। কারণ, এছাড়া উপায় নেই। আমি দিদির ভক্ত। দিদি যেমন যতই খারাপ কিছু হোক 'ভোট রাজনীতি'কে তালাক দিতে পারেন না, আমিও তেমনই প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের তালাক দিতে পারি না।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'তিন তালাক' নির্বাসিত। তাতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সব মহল। সব রাজনৈতিক দলই নিজেদের মতামত জানিয়ে দিয়েছে রায় ঘোষণার পরে পরেই। কিন্তু দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তাতে রাজনৈতিক মহলের জল্পনার থেকেও বেশি অনিশ্চয়তা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের। অবাক লাগছে? তবে শুনুন সেই দিনের কাহিনি। ঘরের কথা বলছি। পাঁচ কান করবেন না প্লিজ।

যেদিন রায় দিল আদালত সেদিন বড় নেতারা ভেবে পাচ্ছেন না মেজ, সেজ নেতাদের কী জবাব দেবেন। আবার নীচের নেতারা বুঝছেন না কর্মীদের কী বলবেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে দলের নীতি কী তা নিয়ে অন্ধকারে গোটা দল। যিনি সব আঁধার কাটিয়ে দিতে পারতেন তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি নীরব। ফেসবুকে, টুইটারে কিছুই জানাননি তিনি। দিনভর নেতাদের উৎকণ্ঠার উত্তর মেলেনি।

তৃণমূলনেত্রী কিছু না বলায় অন্য নেতারাও চুপ। কারণ, তালাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় দলে মারাত্মক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। কী কী ভয়? সংখ্যালঘু ভোটের কথা মাথায় রেখে এতদিন দল খুব স্পষ্ট না করলেও তালাক প্রথার উপরে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়ে এসেছে। প্রকাশ্যেও সমর্থন দিয়েছে দলেরই নেতা তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীদের দাবিতে। এখন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী প্রকাশ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে সরব। কিন্তু সেই নীতি গোটা দল নিলে হিতে বিপরীত হবে না তো? প্রশ্ন দলের উপর থেকে নীচে।

তৃণমূল নেতাদের একাংশের বক্তব্য, দলের বেশির ভাগ নেতা, কর্মী, সমর্থক তালাক প্রথা বিলোপে খুশি। সেখানে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মতো একজন নেতা, নাকি বাকিদের মতামত, কোনটা গুরুত্ব পাবে? আর এ থেকেই তৈরি হয়েছে তিনটি প্রশ্ন। যা ভাবাচ্ছে নেতাদের। তৈরি করেছে ভয়।

১। উত্তরপ্রদেশের মতো মুসলমান-অধ্যুষিত রাজ্যে বিজেপির ভাল ফল বুঝিয়ে দিয়েছে একটা বড় সত্য। প্রচারে নরেন্দ্র মোদী তালাক ইস্যু তোলায় মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশের ভোট পেয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি। এই রাজ্যের পরিণতিও কি তেমন কিছু হবে?

২। তালাক প্রথা বিলোপ হওয়াতে মুসলমান সমাজের মহিলারা খুশি। এটা স্বাভাবিক। তবে কি দলের মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের মহিলা অংশকে হারাবে তৃণমূল কংগ্রেস?

৩। মুসলমান সমাজের একটা অংশের পুরুষও এই প্রাচীন রীতি বন্ধ হওয়ায় খুশি। আবার বড় অংশ অখুশিও। এই দুই পক্ষই তৃণমূল কংগ্রেসের নীতি নিয়ে আঁধারে। ভোট রাজনীতিতে এই পরিস্থিতির কী এবং কেমন প্রভাব পড়বে?

মূল এই তিনটি প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। দলের অবস্থা ঠিক যেন 'শাঁখের করাত'-এর মতো। দলের দুই মুসলমান মুখ আবদুল রেজ্জাক মোল্লা আর সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। রেজ্জাক বলছেন, এই রায় ভাল। আর সিদ্দিকুল্লা বলছেন, এই রায় মানেন না। দিদির অবস্থাটা একবার ভেবেছেন! কাকে ছাড়বেন আর কাকে ধরবেন?

শুধু কি আদালতের রায় অস্বীকার করা! দিদির সিদ্দিকুল্লা ভাই বলেছেন, "আদালত যাই বলুক তালাক বন্ধ হবে না। এখন এই মুহূর্তে যদি কেউ তিন তালাক দেয় তবে কি কেউ কিছু বলবে? কেউ ঠেকাতে পারবে না। ঠেকানো যাবে না। পরিবেশ না তৈরি করে ঠেকানো যাবে না। শরিয়ত আইনে তো তালাকের অধিকার আছেই। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ভারত সরকার যতক্ষণ না পার্লামেন্টে আইন করছে ততক্ষণ বাধা দেওয়া যাবে না। ছ' মাস তালাক দেওয়া যাবে না, ছ' মাস বিয়ে করা যাবে না, এটা বলে দিলেই হলো! এই আইনটা মিডিয়া খাওয়াচ্ছে।"

সিদ্দিকুল্লার দাবি এখানেই শেষ হয়নি। তিনি বলেছেন, 'কোনও মেয়ের ক্ষতি হোক, আমরা চাই না। কিন্তু মেয়েরা কি পুরুষদের বাদ দিয়ে চলতে পারবে? যে মহিলারা খুশি বলা হচ্ছে তাঁরা মুসলমান পুরুষের কাছে যাবে, না হিন্দু পুরুষদের কাছে যাবে? খবরের কাগজে বড় বড় কথা আর ছবি! ওই মেয়েদের বিয়ে-শাদি কোথায় হবে? মুসলমানদের সঙ্গেই হবে। অতএব ব্যাপারটায় তো সমন্বয় তৈরি করতে হবে। মেয়েরা একা বিয়ে করতে পারবে? মেয়েদের হাতে তালাকের ব্যবস্থা আছে? থাকবে না কোনও দিন। এই বিতর্কে যদি কেউ ভাবে জিতে গিয়েছে, তবে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।"

কী ভাবছেন এটা মুসলমান মেয়েদের হুমকি! দিদি কিন্তু তা ভাবছেন না। কারণ, এখনও পর্যন্ত তিনি সিদ্দিকুল্লা ভাইকে একটিবারের জন্য চুপ করতে বলেননি। সুতরাং, দিদিও চান তালাক প্রথা থাকুক। কিন্তু একটাই ভয় পাচ্ছি। ভোটাররা দিদিকে তালাক দেবে না তো!

—সুন্দর মৌলিক

তিল তালাক অসাংবিধানিক, অবৈধ : সুপ্রীম কোর্ট অনড় মৌলবাদীরা

পরমেশ্বর রায়

মর্জিমাফিক এক নিঃশ্বাসে তিনবার তালাক বললেই বিচ্ছেদের দিন শেষ। মুসলমান মহিলাদের অধিকার সুনিশ্চিত করে সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছে ১৪০০ বছর ধরে চলে আসা তাৎক্ষণিক তালাক প্রথা ভারতে অবৈধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের মত তাৎক্ষণিক তালাক ভারতীয় সংবিধানের সমানাধিকারের চূড়ান্ত পরিপন্থী।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, আগামী ছ'মাস তিনবার তালাক বললে কোনও বিচ্ছেদ হবে না। এই ছয় মাসের মধ্যে আইন প্রণয়ন করতে হবে আইনসভাকে। যদি সেই সময়ের মধ্যে নতুন আইন প্রণয়ন না হয় তবে এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে।

তিন তালাক বা তালাক-এ-বিদ্বত কি? তালাক-এ-বিদ্বত অনুসারে তিন বার তালাক উচ্চারণ করেই বিয়ে ভেঙে দেওয়া যেত। এই উপায়ে কোনও পোস্টকার্ড, চিঠি, ইমেল, এমনকী হোয়াটস্আপের মাধ্যমে তালাক দেওয়া হোত। পরে যদি স্বামী ফের সম্পর্ক জোড়া লাগাতে চান তবে একমাত্র উপায় নিকাহ হালালা অর্থাৎ অন্য কাউকে বিয়ে করে সেই বিয়ে ভেঙে আবার নিকাহ করতে হবে তাকে।

মামলার ইতিহাস : দীর্ঘদিনের সংসার ভেঙে ৬২ বছরের শাহবানোকে তালাক দিয়ে নতুন সাদি করে তার স্বামী, সালটা ১৯৭৮। তখন হাতে না আছে টাকা আর না আছে নতুন সাদি করে ঘর করার বয়স। পাঁচ সন্তানের মা শাহবানোর আশ্রয় তখন রাস্তায়। স্বামীর কাছে তার শেষ দাবি ছিল, কমপক্ষে দু'বেলা দুমুঠো খাবার জোটে তার ব্যবস্থা করার। তিন তালাকের ধর্মীয় দোহাই দিয়ে তার স্বামী বলেছিলেন, তিনি খোরপোশ দিতে বাধ্য নন। প্রতিবাদী শাহবানো থেমে থাকেননি, হাজির হয়েছিলেন আদালতের দোরে। সাত বছরের চুলচেরা বিচারের পর ১৯৮৫ সালে শীর্ষ আদালত বলল, শাহবানোকে ১৭৯ টাকা খোরপোশ দিতে হবে। আদালতের মতে সি আর পিসির ১২৫ নং ধারা সব ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাহবানো জয় পেল। কিন্তু ইন্দিরা মৃত্যুর সিমপ্যাথী ঝড়ে লোকসভার দুই তৃতীয়াংশের বেশি ভোটে জেতা রাজীব সরকার ১৯৮৬ সালে সংসদের আইন করে ৬৯ বছরের শাহবানুর মুখের অন্ন কেড়ে নিল।

ঘটনার ৫০ বছর পর আদালতে জমা পড়ল আরও পাঁচটি কেস। উত্তরাখণ্ডে কাশীপুরের শায়রা বানো, সমাজশাস্ত্রে এমএ, ২০০১ সালে বিবাহের ১৪ বছরের পর তার স্বামী ফেসবুকের পোস্টের মাধ্যমে তাকে তালাক দেয়। জৌনপুরের আফরীন রহমান, আইনে স্নাতক, এর বিয়ে হয় ২০১৪ সালে। বিয়ের বছরের আগেই স্পিড পোস্টে তালাক দেয় তার স্বামী। সাহারনপুরে আতিয়া সায়রী-র ২০১২ সালে বিয়ে হয়। দু' সন্তানের জন্মের পর ২০১৬ সালে সাদা কাগজে আতিয়াকে তালাক লিখে একতরফা বিচ্ছেদ করে তার স্বামী।

রামপুরে পরভিন কেও বিয়ের ৩ বছরের মাথায় দশ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে লিখে তালাক দেয় তার স্বামী। হাওড়ার ইশরাত সাহনকে বিয়ের ১৫ বছর পর দুবাই থেকে ফোনে তালাক দেয় তার স্বামী। এই পাঁচজন আদালতে বিচার চায়। আতিয়া সায়রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তিন তালাক প্রথা অবসানের দাবি করে। ষষ্ঠ আবেনদকারী ভারতীয় মুসলমান মহিলা আন্দোলন। যাদের দাবি ছিল তিন তালাক সমানতার অধিকারের পরিপন্থী। ১৬ অক্টোবর ২০১৫ সুপ্রিমকোর্ট হিন্দু উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে সংবিধানিক বেঞ্চ প্রধান বিচারপতিকে এ বিষয়ে বেঞ্চ গঠনের কথা বলে। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আদালত তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেলকে 'তিন তালাক' 'নিকাহ হালালা', 'বহুবিবাহ' নিয়ে বিচারপ্রার্থীদের সহযোগিতা করতে বলেন।

২৪ মার্চ ২০১৬ : সুপ্রিমকোর্ট মহিলা ও আইন, বিবাহ তালাক, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইন নিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দাখিল করতে বলে। ২৯ জুন ২০১৬ : আদালত 'তিন তালাক' সংবিধান সম্মত কিনা বিচার করতে সম্মত হয়। ২৭ মার্চ ২০১৭ : অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড কোর্টকে জানায় তালাক নিয়ে বিচার করার এক্তিয়ার কোর্টের নেই। ৩০ মার্চ ২০১৭ : সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাকের বৈধতা নিয়ে সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনের কথা বলে। ১১ মে ২০১৭ : কোর্ট বলে তারা বিচার করে দেখবে তিন তালাক ইসলাম সম্মত কিনা। পাঁচ ধর্মের বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত প্রধান বিচারপতি জে এস কেহর (শিখ), বিচারপতি আব্দুল নাজির (মুসলমান), বিচারপতি কুরিয়ন জোসেফ (খ্রিস্টান), বিচারপতি রোহিন্তন কলি নরিম্যান (পার্সি) ও বিচারপতি ইউ ইউ ললিত (হিন্দু)। সাংবিধানিক বেঞ্চ বিচার কাজ শুরু করে। ছয়দিন চলা শুনানিতে তিনদিন আবেদনকারীর এবং তিন দিন অন্য পক্ষের কথা শোনা হয়। ২২ আগস্ট ২০১৭ : সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে বেঞ্চ

তালাক-এ-বিদ্বতকে নিষিদ্ধ করে।

২২ আগস্ট কোর্টরুম লাইভ :

কোর্ট আগেই জানিয়েছিল ২২ আগস্ট বেলা ১০-৩০ মিনিটে কোর্ট তার রায় দেবে। কিন্তু বেলা ৯-৪৫ মধ্যে কোর্ট চত্বরে ঠাসা সংবাদ মাধ্যমের গাড়ি আর সাংবাদিকে ছয়লাপ। কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা। কেন্দ্র আগেই রাজ্যগুলিকে সুরক্ষা অ্যালার্ট দিয়ে দিয়েছে। যাতে রায় নিয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না সৃষ্টি হয়। ঘড়ির কাঁটা ১০-৩০; প্রধান বিচারপতি জে এস কেহর তাঁর রায়ে বলেন, তিন তালাক সংবিধানের ২৫, ১৪ ও ২১ নং ধারার বিরোধী নয়— পার্সোনাল ল'-এর অংশ হিসেবে এটি পালন করা হলে বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপে সেটি খারিজ করা যায় না। অবশ্য সরকার এ বিষয়ে আইন বানাতে পারে। সংবাদ মাধ্যমে রটে যায় সুপ্রিম কোর্ট তিন তালাককে বৈধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু এর পরেই বেঞ্চের দ্বিতীয় বরিষ্ঠ বিচারপতি কুরিয়েন জোসেফ তাঁর রায়ে জানান, তিন তালাক ধর্মের অংশ নয়। তিন তালাক কোরান ও শরিয়তের বিরোধী। বিচারপতি রোহিন্তন ফলি নরিম্যান তাঁর রায়ে বলেন, এটা বিবাহ বিচ্ছেদের অননুমোদিত পথ। সংবিধানের ১৪ নং ধারা বিরোধী। বিচারপতি ইউ ইউ ললিত নরিম্যানের মতকে সমর্থন করলেও বিচারপতি আব্দুল লজির প্রধান বিচারপতির মতকে সমর্থন জানায়। তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় ১১টার ঘর ছুঁয়েছে, প্রধান বিচারপতি জানান ৩ : ২ অনুপাতে তিন তালাক মামলার নিষ্পত্তি হলো। অর্থাৎ পাঁচ জনের তিনজন তাৎক্ষণিক তিন তালাক বাতিলের পক্ষে, অন্য দুই বিচারপতি বিপক্ষে। ৩৯৫ পাতার এই ঐতিহাসিক রায়ে তিন তালাককে অসংবিধানিক, অবৈধ, ইসলামের অংশ নয় বলে ঘোষণা করা হয়।

মুসলমান সমাজে রায়ের প্রভাব :

১. একবারে তিন বার তালাক বললেই বিচ্ছেদ হবে না।

২. মুসলমান বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলারা নিজের ও তার সন্তানের জন্য খোরপোশের দাবি পেশ করতে পারবে।

৩. মুসলমান মহিলাদের মন থেকে তিন তালাকের ভয় কাটবে। ফলে তাদের মানসিক ও শারীরিক শোষণ কমবে।

৪. মুসলমান মহিলা পুরুষের বৈষম্য কমবে।

৫. মুসলমান মহিলারা নিকাহ হালালা থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাবে।

রায় নিয়ে রাজনৈতিক ঝড় :

বিজেপি অনেক আগে থেকেই মুসলমান মহিলাদের সমান অধিকার, সমান আইন, তিন তালাক নিষিদ্ধের দাবিকে সমর্থন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবারের লালকেল্লা থেকে ভাষণেও মুসলমান মহিলাদের দাবি নিয়ে সরব হয়েছেন। ফলে রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় ঐতিহাসিক। এটা মহিলা ক্ষমতায়ন ও মুসলমান মহিলাদের সমান অধিকারের দাবিকে শক্তি জোগাবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বিচারপতিরা এই রায়ে ঐকমত্য দেখাতে পারলে দারুণ হোত। মহিলা ক্ষমতায়নের পক্ষে এই রায় ঐতিহাসিক মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। বিজেপি অধ্যক্ষ অমিতশাহ একে মুসলমান মহিলাদের সমানাধিকারের লক্ষ্যে এক নতুন যুগের সূচনা বলে ঘোষণা করেন। কংগ্রেস প্রথমে রায় নিয়ে দোমোনায় ছিল যেহেতু কংগ্রেসের বড় নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী কপিল সিব্বাল কোর্টে তালাকে পক্ষে দাবি পেশ করেছিল। কিন্তু কপিল সিব্বাল নিজেই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই রায় তিন তালাককে খারিজ করলেও পার্সোনাল ল' কে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এর পরেই আসরে নামে কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন— সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত। সিপিএম পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকেও রায়কে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু সিপিআই-এর ডি রাজার সাবধানি বচন, এই উদ্যোগ একটি নির্দিষ্ট ধর্ম, সম্প্রদায় বা পার্সোনাল ল'-এ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বসপা নেত্রী মায়াবতী রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন— পার্সোনাল ল' বোর্ড আগেই তিন তালাক বন্ধের উদ্যোগ নিলে ভালো হোত কিন্তু তা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দল অবশ্য এই রায় নিয়ে নীরব যদিও মন্ত্রীসভার দুই হেভিওয়েট মন্ত্রী রায় নিয়ে বিপরীত মত পোষণ করেছে। মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লার মতে তিন তালাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় দেওয়াটাই বেআইনি, অন্যদিকে প্রাক্তন কমরেড রাজ্জাক মোল্লা এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেন, শুধু তিন তালাক কেন? পুরো শারিয়ত আইনই বিলুপ্ত করা উচিত। সাম্যের ভিত্তিতে আমাদের আধুনিক আইন প্রয়োজন। মুসলমান সমাজে রায়ের পক্ষে বিপক্ষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ফতেপুরী মসজিদের মৌলানা সুফি মুজ্জরম বলেন, এই রায় মুসলমানদের সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। অন্যদিকে জামা মসজিদের শাহি ইমাম বুখারি বলেন, যেহেতু বোর্ড মুসলমান মহিলাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি তাই এই রায়। মুসলিম ল' বোর্ডের সদস্য কাসিম রসুলের মতে তিন তালাককে বড় করে দেখানো হচ্ছে। যদিও সুন্নী উলেমা কাউন্সিল ও রাষ্ট্রবাদী মুসলিম মঞ্চ রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। সাংবাদিক লেখক মইদুল হাসান রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভারতের ৯৫ শতাংশ বিবাহ বিচ্ছিন্ন মুসলমান মহিলা কোনো খোরপোশ পায় না। ৪৪ শতাংশ ক্ষেত্রে বিয়ের ৩ বছরের মধ্যে তালাক হয়ে যাচ্ছে। তালাক প্রাপ্ত মহিলার মধ্যে ৪৩.৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ২১। ১১ শতাংশ মুসলমান মহিলা পরিত্যক্তা অথবা বিবাহ বিচ্ছিন্না। অনেকে এই রায়কে সমান আইন সহিংতার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ বলেও মনে করছে। বর্তমান ক্ষমতাশীন বিজেপি সরকার শুরু থেকে এই দাবির পক্ষে। ফলে এক দেশ এক আইন বোধহয় সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ■

আপিল বিভাগের রায়
হাসিনার ঘুম কেড়ে নিয়েছে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের সর্বসম্মত রায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘুম কেড়ে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত করে প্রণীত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় ও প্রধান বিচারপতির কিছু পর্যবেক্ষণ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামি লিগের নেতারা মানতে

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা

শেখ হাসিনা

পারছেন না। বিচার বিভাগকে চাপে রাখতে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাত থেকে নিয়ে জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল, জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠনের পর বিচারপতিদের 'সরকারের চাওয়া মোতাবেক' কাজ করতে বাধ্য করা। মাথার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল অপসারণের খড়্গ। এই সংশোধনী প্রথমে হাইকোর্ট, পরে আপিল বিভাগ বাতিল করে দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রায়ে বিচারপতিদের কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। প্রধান বিচারপতি মুক্তিযুদ্ধ থেকে গণতান্ত্রিক ধারা, বর্তমান জাতীয় সংসদ ও সামরিক শাসন সব বিষয়ে কিছু মত দিয়েছেন। আর এই মতই আওয়ামি লিগ মানতে পারছে না। শেখ হাসিনা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চান, ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ও প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ এই 'চাওয়া'র প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হয়েছে, প্রধান বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে একথা বলা সত্ত্বেও অভিযোগ করা হচ্ছে, প্রধান বিচারপতি বঙ্গবন্ধুকে অবমূল্যায়ন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে নেতা-নেত্রীদের সবাই এক সুরে বলেছেন, প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণের এক জায়গায় 'নো নেশন, নো ক্যান্ট্রি ইজ মেড অব অর বাই ওয়ান পারসন' —এই কথা বলে বঙ্গবন্ধুর অবদান অস্বীকার করেছেন। পাল্টা যুক্তি হিসেবে যতোই বলা হোক ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় ও পর্যবেক্ষণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আমিত্ববাদের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ উচ্চারণ, আওয়ামি লিগ প্রশ্ন তুলছে, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কোনো নেতৃত্ব কি ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য? খোদ শেখ হাসিনা বলছেন, পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চের পরে বঙ্গবন্ধুকেই পাকিস্তান ভাঙার জন্যে দায়ী করেছিলেন। আর কারো নাম উচ্চারণ করেননি। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়, সামরিক আদালতে বিচারের পর ফাঁসির আদেশ হয়। আওয়ামি লিগ বলছে, কারো একক নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়নি বলে যারা দাবি করছেন, তারা ইতিহাস বিস্মৃত হন কী করে? বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, যদি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়, তাহলে একক নেতৃত্বের বিষয়টি তো গৌণ হয়ে যায়। স্বাধীনতাকামী দেশের প্রত্যেকটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আওয়ামি লিগ মুক্তিযুদ্ধকে আওয়ামিকরণ করছে। আর কারো অবদান স্বীকার করতে চাইছে না।

প্রধান বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে জিয়াউর রহমানকে অবৈধ সেনাশাসক বলে যেমন তিরস্কৃত করেছেন, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির ভোটারবিহীন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেও তিরস্কার করেছেন। ফলে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ আওয়ামি লিগ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামি লিগ বলছে, পর্যবেক্ষণে এসব বিষয় আসার প্রয়োজন ছিল না। আওয়ামি লিগের ক্ষোভের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এই নির্বাচনকে বিএনপিও ভোটারবিহীন নির্বাচন বলে দাবি করে, সমালোচনা করে। এখন বিএনপি এই রায়ে একটা বড় রকমের অস্ত্র পেয়ে গেছে। বলছে, এতদিন বিগত নির্বাচন নিয়ে যে বক্তব্য তারা দিয়ে আসছিলেন এবং আগামী নির্বাচন তদারকি সরকার বা সহায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের যে দাবি জানিয়ে আসছিলেন, সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও পর্যবেক্ষণে তারই যৌক্তিকতা মিলল। নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো এবং বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু প্রধান বিচারপতির রায় ও

পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় রায় দিয়েছেন। আওয়ামি লিগ তাদের ভাবমূর্তিতে আঘাত লাগায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রধান বিচারপতি কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুকে খাটো করেননি, তিনি অকপটে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্থপতি বলেছেন। প্রবীণ আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার রায় ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামি লিগ নেতাদের। তারা মনে করছেন বিচারপতি সিনহার রায় ভালোভাবে না পড়েই শোরগোল হচ্ছে।

ষোড়শ সংশোধনীর রায়ের অব্যবহিত পর জাতীয় সংসদে প্রধান বিচারপতি সিনহার নাম সরাসরি উল্লেখ করে মন্ত্রী ও সাংসদরা কঠোর ও অশালীন ভাষায় সমালোচনা করেছেন। সংসদের বাইরেও আওয়ামি লিগ মন্ত্রী ও নেতারা প্রত্যেক দিনই সিনহার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এক কালের জাঁদরেল বামনেত্রী, বর্তমানে যিনি শেখ হাসিনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মন্ত্রী বলে বর্ণিত, অশালীন ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি সুপ্রিম কোর্ট ভবনের সামনে ন্যায়বিচারের প্রতীক নারী ভাস্কর্য স্থাপনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সিনহা ইসলামি দেশে সর্বোচ্চ আদালতের সামনে মূর্তি (সবাই ভাস্কর্য বললেও তিনি কিন্তু মূর্তি বলেছেন, এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ) স্থাপন করে একটা দাঙ্গা বাঁধানোর উপক্রম করেছিলেন। এক কালের এই বামনেত্রী এখন হেফাজতসহ ইসলামপন্থীদের সঙ্গে আওয়ামি লিগের জোট গড়ায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এখন তিনি নাকি যুক্তি দেখাচ্ছেন, জামায়াতে ইসলামির যারা আওয়ামি লিগের পতাকার নীচে এসে কাজ করতে চায় তাতে আপত্তির কী আছে। তিনি এক তত্ত্ব দিয়েছিলেন, মুক্তিযোদ্ধারও এক ভোট জামায়াতি-রাজাকারেরও এক ভোট। শেখ হাসিনার এই ঘনিষ্ঠ নেত্রী ও মন্ত্রী এখন 'হিন্দু' প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। উস্কে দিচ্ছেন, 'হিন্দু' প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই মন্ত্রী কয়েক বছর আগে উগ্র ধর্মান্ধ খেলাফতে মজলিশের সঙ্গে আওয়ামি লিগের আট-দফা সমঝোতা চুক্তি করিয়েছিলেন। আন্দোলনের মুখে এই চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন শেখ হাসিনা।

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ও প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ নিয়ে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে শুধু আন্দোলন নয়, কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় এ নিয়ে কথা বলতে কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামি লিগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও প্রজাতন্ত্রের প্রধান আইনি কর্মকর্তা এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রায় তিনঘণ্টা স্থায়ী এই বৈঠকে সংবাদপত্রের ভাষায় 'পরবর্তী পদক্ষেপ' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। 'পরবর্তী পদক্ষেপ' কী ব্যাখ্যা মেলেনি। তবে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আরও আলোচনা হবে। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের বৈঠক অস্বাভাবিক। স্মরণকালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন বৈঠক দেখা যায়নি। সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য ড. কামাল হোসেন বলেছেন, যা হচ্ছে, পুরোই আদালত অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের পর্যবেক্ষণে কোথায় বঙ্গবন্ধুর অবমাননা হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না। আওয়ামি লিগ নেতাদের উচিত, রায় ও পর্যবেক্ষণ ভালো করে পড়ে দেখা। মূল কথা বঙ্গবন্ধুর অবমাননা নয়, প্রধান বিচারপতিকে 'টার্গেট' করা। কথামতো না চললে, আওয়ামি লিগ 'টার্গেট' করে এটা নতুন কিছু নয়। আওয়ামি লিগের এক শীর্ষ নীতিনির্ধারক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততার পর্যায়ে চলে গেছে। দল ও সরকার শক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে।

আওয়ামি লিগ সমর্থক কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বলেছেন, তারা পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কিত। আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব পরিস্থিতি যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে শেষ পর্যন্ত লাভ হবে বিএনপির। একথা আওয়ামি লিগ নেতারা বুঝতে পারছেন না। বিএনপি দীর্ঘ আন্দোলনে যা করতে পারেনি, আওয়ামি লিগ তাদের সেই সুবিধা করে দিচ্ছে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

আচার্য রাধাকৃষ্ণান ভারত-আত্মার এক মহান রাষ্ট্রদূত

তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতবর্ষ মনে করে শিক্ষা হলো জীবন বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ। ভারতবর্ষ বিদ্যাকে মুক্তির পথ বলে অনুভব করলেও এই জগতের সকল সুচারু প্রবৃত্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ভাস্কর্য, নৃত্যকলা কোনোটাকেই অস্বীকার করেনি। মানুষের জীবনের উত্তরণ ও পূর্ণ প্রকাশই ছিল শিক্ষার স্বরূপ। শিক্ষায় এই মানসালোকে সত্য দর্শনের কারিগর হলেন শিক্ষক। অতীতে ছাত্ররা গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। প্রকৃতির নির্মল পরিবেশ তাদের জীবন অনুশীলনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল। আচার্য ছাত্রকে নিজের আশ্রমে উপনয়নের মাধ্যমে নিজের গর্ভে ধারণ করতেন— 'আচার্যঃ উপনয়ন মানো ব্রহ্মচারীনম্ কৃণুতে গর্ভমান তহ'। বিদ্যার্থী প্রথমে জন্মলাভ করতেন মাতৃগর্ভ হতে— এটা তার দৈহিক জন্ম। উপনয়নের মাধ্যমে শিক্ষক বা আচার্যের মানস-গর্ভ হতে, আত্মার গর্ভ হতে জন্ম গ্রহণ করতো এটা ছিল তার আধ্যাত্মিক জন্ম। এই একটি প্রথা বিশ্বকে ধারণা দিয়েছিল ভারতীয় শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে শিক্ষকের স্থান কোথায়? ৫ সেপ্টেম্বর ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিন শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হয়। তাঁর জীবন ছিল এক আদর্শ শিক্ষক জীবনের মূল্যবান আধার। তাঁর অপরিসীম জ্ঞান সাধনা ও বিদ্যা অর্জন (Books, the vistas they unveil and dreams they awaken, have been from the begining, my constant and unfailing companions.) অপূর্ব শিক্ষা পদ্ধতি, অধ্যাপনা কালে তাঁর ছাত্রপ্রীতি তাঁকে 'Students Prince' নামে অভিহিত করেছিল। রাধাকৃষ্ণান বলতেন— ধর্ম হলো মানবাত্মার এক দুঃসাহসিক অভিযান। এই অভিযানের ফলে মানব দেবসন্তানে পরিণত হয়। রাধাকৃষ্ণান দুঃখ-কষ্টকে জীবনের শাস্তি বলে মনে করেননি— একে তিনি অনুশাসন

বলতেন। তাই তাঁর কাছে শিক্ষকের জীবন সত্যের অনুসন্ধানে রত এক জীবন সাধনা ছিল। তিনি বলেছেন— সভ্যতা হলো মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ফলশ্রুতি। অধ্যাত্ম জীবন বিকাশই শিক্ষকের তপস্যা! এই তপস্যার সাধক হতে হলে শিক্ষককে নিজের জীবনকে খাঁটি সোনা করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকের জীবন সাধনায় কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নাই।

রাধাকৃষ্ণানের জীবন ছিল সর্বব্যাপী শিক্ষকতার জীবন। একজন শিক্ষক তিনি শুধুমাত্র একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক নন, তিনি সমাজ, রাষ্ট্র— প্রয়োজনে বিশ্বের শিক্ষক। ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের মহতীযজ্ঞে রাধাকৃষ্ণান এক একনিষ্ঠ ঋত্বিক ছিলেন। বহুস্থানে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। একবার তাঁর সামনে সুযোগ এল ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে যাওয়ার। আজকের কূটনীতির পরম্পরায় রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য ভিন্ন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণান ভারত আত্মার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রকৃত রাষ্ট্রদূত রূপেই কাজ করেছিলেন।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি রচনায় রাশিয়ার কাছে বলিষ্ঠ এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণের প্রয়োজন ছিল। নেহরু এই কাজের জন্য নিজের বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে রাষ্ট্রদূত করে রাশিয়ায় পাঠালেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ব্যর্থ হলেন। এমনকী তিনি যতদিন ছিলেন তদানীন্তন জগতের বলিষ্ঠ ও দুর্ধর্ষ রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগও পাননি। ফলে মিসেস পণ্ডিতকে ওয়াশিংটনে পাঠানো হলো। নেহরুর অনুরোধে রাধাকৃষ্ণান কনস্টিউট অ্যাসেমব্লির সদস্যপদ ছেড়ে রাষ্ট্রদূত হয়ে এলেন রাশিয়ায়। সারা বিশ্ব জানল ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরার সার্থক উত্তরসূরি রূপে রাধাকৃষ্ণান চললেন রাশিয়ায়— একজন ভারতীয় পোশাক পরিহিত সাধারণ শিক্ষক— যিনি আত্মার শক্তিতে ভরপুর।

স্ট্যালিন তখন রাশিয়ার প্রধান শাসক। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে খেই হারিয়ে ফেলতেন। স্বৈরতন্ত্রী এই দুর্ধর্ষ রাষ্ট্রনায়ককে ভয় পেতেন বহু রাষ্ট্রের নায়কেরা। অথচ রাধাকৃষ্ণান মস্কো পৌঁছানোর পর তিনি বার্তা পেলেন দেখা করার জন্য স্ট্যালিন তাঁকে ক্রেমলিনে ডেকেছেন। স্ট্যালিন বড় বড় রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় দিতেন গভীর রাতে। কিন্তু ভারতের এই ঋষিসদৃশ রাষ্ট্রদূত ঘুমোতে যান আগে। ওঠেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে— তাই রাত্রি ৯ টার সময় সাক্ষাতের সময় ঠিক হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে ছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেশ্বর দয়াল আর স্ট্যালিনের সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিশিংকি। প্যাভলভ দোভাষীর কাজ করেছিলেন।

রাধাকৃষ্ণানকে সম্ভাষণ জানালেন স্ট্যালিন— সম্বোধন করলেন 'আচার্য' (প্রফেসর) বলে। প্রত্যুত্তরে নমস্কার জানালেন রাধকৃষ্ণান— সম্বোধন করলেন 'মার্শাল' বলে। রাষ্ট্রদূত বললেন, 'মার্শাল, আপনার কাছে আমার জন্য কত কড়া নিরাপত্তা, দেখা করার জন্য কতরকম অসুবিধা— মার্শাল এত ভয় কীসের? মৃত্যুকে কি আপনি ভয় করেন?' বিস্মিত স্ট্যালিন। উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। স্ট্যালিনই

সেটা ভেঙে দিয়ে বললেন— 'প্রফেসর। এই তো আপনার সঙ্গে দেখা করলাম। অসুবিধা কীসের? 'রাধাকৃষ্ণান রুশ-ভারতের রাজনীতির কথা শুরু করলেন। বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ টানলেন। কিন্তু স্ট্যালিনকে এই কথাও জানালেন ভারত অন্ধ আনুগত্য দিয়ে রাশিয়ার কাছে কোনো কিছুই গ্রহণ করবে না যেটা ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় নয় (India was under no obligation to copy from Russia anything that did not suit her.) বহু কথা হয়েছিল এই প্রফেসর আর মার্শালের সঙ্গে--- যে সব কথা রাষ্ট্রনীতির দুর্বোধ্য বেড়াজাল অতিক্রম করে প্রাণবন্ত হৃদয়ের গভীর সান্নিধ্যে ধরা পড়ে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্ট্যালিন ক্ষমতায় এসেছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষের এক মহান ঐতিহ্যের মর্মবাণী শুনিয়েছিলেন স্ট্যালিনকে— বলেছিলেন ভারতবর্ষের সম্রাট অশোকের কথা যিনি কলিঙ্গযুদ্ধের পর যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আর স্ট্যালিন— তিনি কী করবেন? —কিন্তু মার্শাল আপনিও তো সেই শক্তির পথ বেয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। কে জানে আপনার জীবনেও তো অশোকের মতো ঘটনা ঘটতে পারে?' অস্বীকার করেননি এই কথায়— মার্শাল বলেছিলেন, মানুষের জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটেই থাকে, আমি তো থিওলোজিকাল সেমিনারীতে পাঁচ বছর ছিলাম।

আসলে বিশ্বজুড়ে মানবাত্মার দর্শন একই অনুভূতিতে প্রতিফলিত হয়--- ভারতবর্ষ এই দর্শন ভাবনারই স্রষ্টা। এই ভাবনার উত্থিত চিন্তন ক্ষেত্র হলো ভারতবর্ষের শিক্ষালয়— রাধাকৃষ্ণান সেই মহতী বাণীরই রাষ্ট্রদূত। বেশিদিন তিনি রাশিয়াতে থাকেনি, উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁকে ফিরতে হয়েছিল। কূটনীতির কাজের অবসরে তিনি উপনিষদ, বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখতেন। তিনি কূটনৈতিক নৈশ্যভোজে যেতেন কিন্তু সব কাজই তিনি রাত্রি ৯টা থেকে ১০ টার মধ্যে শেষ করতেন। মস্কোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষায়তনের পণ্ডিত ব্যক্তিরা আসতেন রাধাকৃষ্ণানের কাছে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য। নৈশভোজের আসর তিনি শেষ করতেন গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে। —এই সবের মধ্যে বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা কোনো রূপ সংকীর্ণতা খুঁজে পাননি। তাঁরা জানতেন রাধাকৃষ্ণানের এই ভাষা— 'the language of Indian mind...it should make them think a little and realize that India is not just a copy of the west."

রাশিয়ার প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও তিনি ভারতীয় পোশাক পরতেন। শুধু গায়ে দিতেন ফারের কোট ও মাথায় ফারের টুপি। তখন রাশিয়া সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মনে এক ভয়ার্ত পরিবেশ ছিল। রাধাকৃষ্ণান আত্মার শক্তিতে ভরপুর ছিলেন— সর্বোপরি তিনি ছিলেন 'আচার্য'— তাই রাশিয়ার অফিসার থেকে ডিপ্লোম্যাট সকলকেই আপন করে নিয়ে বলেছিলেন— ''As I was not a professional diplomat, I approached my duties here in a friendly and human way and I did not find any great difficulties. I was able to explain to your leaders the fears and apprehensions of the outside world about your policies and I did not find any iron curtain of in communi-cabitlety."

রাশিয়ার মানুষের প্রতি এই সহজাত সম্ভাষণ তাঁকে আচার্যের আসন প্রদান করেছিল। যাঁরা রাধাকৃষ্ণানের কাছে এসেছেন বিভিন্ন কাজে, কাউকেই তিনি নিরাশ করেননি। সকলেরই পাশে থেকেছেন। বস্তুত— ''there was an affectionate guru and took pains to instruct people to guide."

রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে প্রথম আলাপের পরেই স্ট্যালিন তাঁর সততা ও দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেদিন স্ট্যালিন প্যাভলডকে বলেছিলেন, ''Radhakrishnan is not a narrow patriot. His heart bleeds for the suffering humanity." মুগ্ধ স্ট্যালিন প্রফেসরকে কি কিছু দিতে চেয়েছিলেন হয়তো বা শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ। তখন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে খাদ্যের তীব্র অভাব ছিল। ''Stalin at the request of Radhakrishnan sent a shipload of wheat to India." এ যেন আচার্যের বাণীর প্রতি দক্ষিণা।

১৯৫২-এর ২৫ এপ্রিল তিনি রাশিয়া ছেড়ে চলে এলেন। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী ভিশিংকি রাধাকৃষ্ণানের সম্মানে ভোজসভায় আয়োজন করেন। রাশিয়ার কূটনৈতিক ইতিহাসে এই ধরনের ভোজ এটাই প্রথম। রাশিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শুনে স্ট্যালিন ছুটে এলেন রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে দেখা করতে। বিদায় দৃশ্যের বর্ণনাটা রাধাকৃষ্ণানের ভাষাতেই তুলে ধরি ''Stalin's face looked some what bloated. I patted him on the cheek and on the back. I passed my hand over his head. Stalin said : 'you are the first person to treat me as a human being and not as a monster. You are leaving us and I am sad. I want you to live long, I have not long to live."

রাধাকৃষ্ণান স্ট্যালিনকে মানুষ রূপেই দেখেছিলেন রাক্ষস রূপে নয়— এই চিন্তন তো ভারতের সভ্যতার, ভারতের সংস্কৃতির--- না হলে প্রাচীনকালের আচার্যদের কণ্ঠ হতে বিশ্বের মানুষের জন্য অমৃতের পুত্র কীভাবে ধ্বনিত। প্রফেসর যে মার্শালের মাথায় আশীর্বাদের অভিষেক চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন— এতো তাঁর স্বভাবজ ধর্ম। স্ট্যালিন অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণানকে— ''Stalin bade him farewell with moist eyes. Such a show of emotions by stalin was unprecedented."

উপরের বর্ণনাগুলো আচার্য রাধকৃষ্ণানের জীবনের এক খণ্ড চিত্র। যে চিত্রে উদ্ভাসিত আছে এক শিক্ষক জীবনের পরম্পরার ইতিহাস। ভারতবর্ষের সেই পরম্পরার উত্তরসূরি রূপে আমাদের শিক্ষক- শিক্ষিকারা সেই পথেরই যাত্রী। শিক্ষক দিবসের মহতী লগ্নে রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে তাঁদেরও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

(শিক্ষক দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

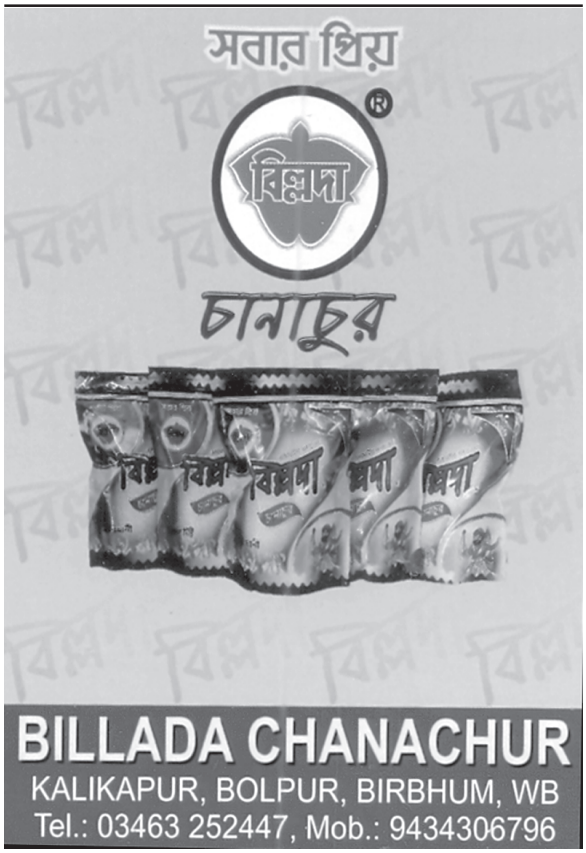

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

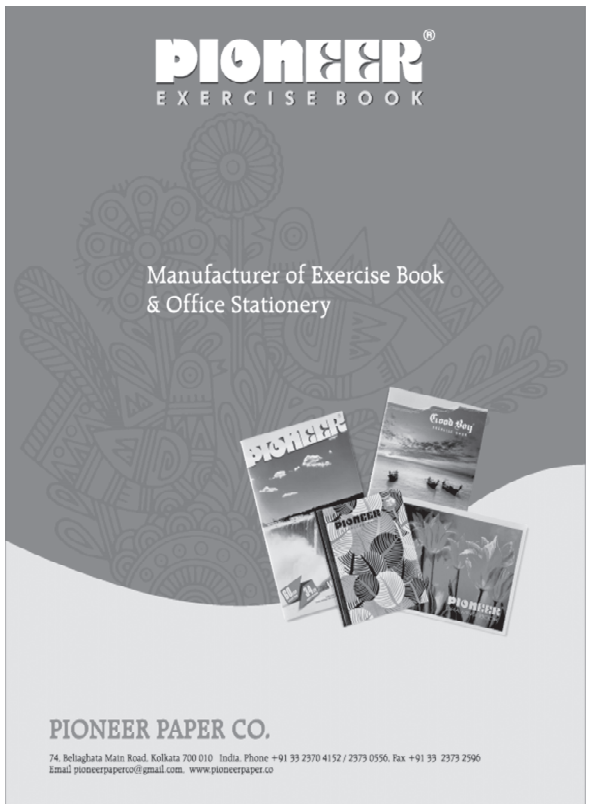

মমতা নিজেও জানেন মহাজোটের কোনও আশা নেই

চিন্তামগ্ন কেজরিওয়াল

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

শোনা যায় অতীতের হঠযোগীরা তাঁদের অধীত বিদ্যায় মাটি থেকে কিছুটা উচ্চতায় অবস্থান করার ক্ষমতা ধরতেন। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্ষিক ২১ জুলাই-এর সভায় সেই কঠিন যোগক্রিয়ার কিছু নমুনা উপস্থাপন করলেন।

টিভি চ্যানেলগুলির সরাসরি সম্প্রচারে অনেকেই চাক্ষুষ করেছেন বিপুল আক্রোশে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ২০১৯-এ মোদীকে হটাবেনই। বলার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি মঞ্চ থেকে প্রায় কয়েক ইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিলেন। এখন প্রশ্ন আসে তাঁর এই তীব্র আক্রমণের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একাধিক। জাতির প্রতি তাঁর এই 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বা 'চলো দিল্লি' ধাঁচের উদাত্ত আহ্বান তুল্যমূল্য বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

(১) ২০১৬ সালের নভেম্বরে সালে বিমুদ্রীকরণের পর তিনি আক্ষরিক অর্থেই ফাঁপরে পড়েন। বিশাল এই দেশে এই আকস্মিক ঘোষণা প্রায় অর্থনৈতিক ভূকম্পের চেহারা নিলেও সাধারণ মানুষকে কোথাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাঙ্ক ভাঙচুর করতে দেখা যায়নি। এই সময় কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জনতার দীর্ঘ লাইনগুলিতে অনেক শাকরেদ নিয়ে ঘোরাফেরা করে তাঁদের খেপাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কলকাতার আর বি আই দপ্তরে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যাদের মধ্যে গালিগালাজে দক্ষ কয়েকজন সাংসদও আছেন, তারা ধর্না দেন। তিনি স্বয়ং গিয়ে আর বি আই কর্তাদের রাস্তায় ডেকে নগদ ও ট্রেজারি সংক্রান্ত কিছু অর্বাচীন প্রশ্ন করেন যেন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটি তাঁর অধীনস্থ একটি দপ্তর। পাঠক, এরই সহায়ক পাঠ হিসেবে স্মরণে আনতে হবে প্রায় বছরখানেক আগে তাঁর গঙ্গা-খাল সংলগ্ন আবাস সংস্কারের কথাটি। সেই সময় প্রথমে শোনা গিয়েছিল কলকাতার মহানাগরিক তাঁর জন্য অস্থায়ী বাসস্থানের খোঁজে বেরিয়েছেন। সংবাদপত্রে জানা যায় তিনি হেস্টিংস অঞ্চলে নাকি উপযুক্ত আবাসের সন্ধানও পান। কিন্তু এর পরই পরিকল্পনা বদল হয়। মুখ্যমন্ত্রী সংস্কারের জন্য বাড়ি পি ডব্লুউ ডি-এর হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর পরিকল্পনা বাতিল করেন। গৃহ-অভ্যন্তরে অবস্থান করেই যা কিছু কাজের অনুমতি দেওয়া হয়। অনেকে বিস্মৃত হলেও এই ঘটনাটি পর্যাপ্ত ইঙ্গিতবহ। বিমুদ্রীকরণের ফলে বিপুল কাঁচা টাকা বাতিল হওয়ার সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ আছে একথা বলার মতো কোনো নির্জলা প্রমাণ না থাকলেও অর্থনৈতিক কোনো ক্লেদ অপসারণের জন্য পতিতপাবনী গঙ্গার ক্ষীণতোয়া হলেও শাখাটি ছিল একেবারে 'হাত বাড়ালেই বন্ধু'।

একটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েই কেজরিওয়ালের দল দেশে ২০১৪ সালে ৪১০ জন প্রার্থী দিয়েছিল। ৩৯৩ জনের জামানত জব্দ হওয়ার পরও তিনি মোদীর বিরুদ্ধে খেউড় করায় নিরস্ত হননি। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী জেটলির নগদ ২৫ শতাংশ জমা দিয়ে করা কয়েক কোটি টাকার মানহানি মামলা সামলাতে নাজেহাল।

মোদী হটানোর ক্ষেত্রে এই পুঞ্জীভূত ক্রোধ অন্যতম নিয়ামক হলেও একমাত্র নয়। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন তাঁকে পাগলপ্রায় করে তুলেছে। কেননা তিনি একটা ভাসা ভাসা হিসেব করেছেন। তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিক, তাঁর বাজার যাচাই করার জ্ঞান বিলক্ষণ আছে। এখন প্রশ্ন কাদের নিয়ে তিনি তথাকথিত মহাজোট অভিযানে নেতৃত্ব দেবেন? তিনি নিজেই বলেছেন— (১) লালুজী আছেন, (২) অখিলেশজী আছেন, (৩) মায়াবতীজী আছেন, (৪) নীতীশজী আছেন, (৬) অরবিন্দজী আছেন এবং (৭) সোনিয়াজী তো আছেনই। তাঁর জবানিতে সবাইকে নিয়ে ১৮ দলের জোট। যাদের নিয়ে সম্প্রতি দিল্লিতে সভাও হয়েছে। এখানে বলা দরকার, দেশে এখন রাজনৈতিক প্রভাবের নিরিখে জাতীয় দলের তকমাধারী রাজনৈতিক দল দুটি, বিজেপি যারা ১৮ রাজ্যে (কয়েক জায়গায় জোট করে) ক্ষমতাসীন, অন্যদিকে কংগ্রেস ৬টি রাজ্যে। তার মধ্যে মিজোরাম, মেঘালয়, পুডুচেরির

মতো শিশুরাজ্য বাদ দিলে কর্ণাটক পঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে সরকার পরিচালক। খাতায় কলমে তৃণমূল বা সিপিএম বা আরও কেউ কেউ জাতীয় দলের স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবে আঞ্চলিক ছাড়া কিছু নয়। এমনই দুটি বড় আঞ্চলিক দল এআইএডিএমকে ও ডিএমকে দক্ষিণে ক্ষমতা বদল করে চলে। আর জে ডি বিহারে সমাধিস্থ অবস্থা থেকে সদ্য জেগে উঠেছে। উত্তর প্রদেশে মুলায়মের পারিবারিক শাসন ও মায়াবতীর দলিতদের নিজের অধীনে বন্দি করে রাখার রাজনীতি সম্প্রতি বিধানসভা ভোটে অবলুপ্ত হওয়ার মুখে। দিল্লিতে ক্ষমতাসীন অবস্থায় কেজরিওয়ালের প্রার্থী জামানত খুইয়েছেন। এরাই দিদির সম্ভাব্য সহচর ও সহচরী। অবশ্যই এঁদের এইসব দেশি ধড়ের ওপর বিদেশি মাথা সোনিয়াজী তো আছেনই।

অন্যদিকে ২৭ আগস্টের মূল আয়োজক লালুজী দাগি রাজনীতিবিদ। দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত। কিছুকাল যাবৎ জামিনে খালাস পেয়েছেন। যে-কোনো সময় অন্য মামলায় আবার হাজতে ঢুকবেন। সাম্প্রতিক খবরে দেখা যাচ্ছে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন যে অগাধ সম্পত্তি করেছিলেন তার অনেক অংশই সেই সময় ছেলেমেয়েদের নামে বেনামি করা। এখন দিন কাল পাল্টে গেছে। বেনামি সম্পত্তি রদ আইন এসেছে। তাঁর পোঁতা বিষবৃক্ষগুলি এখন প্রকাশ্যে বিষফল সমেত মাথা তুলছে। পুনর্বার সপরিবারে জেলযাত্রার সম্ভাবনা তাঁর প্রবল। তিনি তাই মোদী বিরোধী। এর সঙ্গে দেশের ভাল মন্দের বা গণতন্ত্র রক্ষার তিলমাত্র সম্পর্ক নেই। গড়পড়তা সংসারি মানুষই বলে থাকে, 'ছেলেরা সব দাঁড়িয়ে গেছে এবার শান্তি'। লালুও সফলভাবে সেই শান্তি পথেই চলেছিলেন। বেনামি সম্পত্তিধারী ছেলেমেয়েরা ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে যাতে চৌর্যবৃত্তির প্রমাণ-সংবলিত ফাইল-টাইলগুলো নষ্ট করতে পারে, সে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিলেন। ঠিক যেমন এখানে সারদা মামলায় পুলিশ এনকোয়ারি বসিয়ে বিভিন্ন গোপন লকার ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে।

এবার মূলায়মজী। এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে তাঁর ছেলে বৌমা, ভ্রাতাগণ রক্তক্ষয়ী গৃহবিবাদে মগ্ন। তিনিও শেষ বয়েসে প্রথমপক্ষের ছেলেকে সিংহাসনারূঢ় দেখতে দেখতে বেশ মশগুল ছিলেন। কোথা থেকে এক মোদী এসে নিঃস্ব করে দিয়ে গেল। এই পরিবারের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের বাসনা চরিত্রানুগ হলেও তার সঙ্গে দেশহিত, রাষ্ট্রহিতের কোনো সম্পর্ক আছে কি? নেই। ইনিও দিদির গুরুত্বপূর্ণ সহচর।

আর রয়েছেন রাজনৈতিক ভাবে ঘোষিত নৈরাজ্যবাদী কেজরিওয়াল। এঁর অধিকাংশ অনুচরই নানা বেআইনি কাজে লিপ্ত। অনেকেই জেলে গেছেন। কোনো সংসদ সংসদেই মাতলামি করছেন। এঁর ক্ষমতা লিপ্সা প্রায় রাজনৈতিক অশ্লীলতার সীমানা ঘেঁষা। একটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েই যাঁরা দেশে ২০১৪ সালে ৪১০ জন প্রার্থী দিয়েছিলেন। ৩৯৩ জনের জামানত জব্দ হওয়ার পরও তিনি মোদীর বিরুদ্ধে খেউড় করায় নিরস্ত হননি। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী জেটলির নগদ ২৫ শতাংশ জমা দিয়ে করা কয়েক কোটি টাকার মানহানির মামলায় সবিশেষ আতঙ্কিত হয়ে খেউড় সংবরণ করে আছেন।

তামিড়নাড়ুর দল এআইএডিএমকে এনডিএ-তে না থাকায় তাদের বর্তমান ৩৭টি লোকসভা আসনের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে— এমনটা ধরে নিয়ে এবং তারা যে তাঁকেই প্রধানমন্ত্রীপদে সমর্থন করবে এমনটা ভেবে নিয়েই মমতা এগোচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে শশীকলা জেলে চলে গেছেন। এঁর সঙ্গেও রাষ্ট্রস্বার্থের তিলেক যোগ নেই। সবাই আপনি বাঁচলে বাপের নাম। নিজ স্বার্থে এমনই সব দুরাত্মার পল্টন তৈরি করছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর নির্বাচনী আসনের পরিকল্পিত ছকটা হয়তো এরকম রয়েছে—

(১) সম্ভবত তিনি বাংলার ৪২ টি না হলে সারদাভূষণ নারদপ্রেমীদের নিয়ে অন্তত ৪০টি আসন পাবেনই।

(২) বিহারে লালুজী নীতীশজী ৪০টির মধ্যে জোট নিয়ে ৩০টি পেয়ে যাবেন।

(৩) এআইএডিএমকে অন্তত ৩০টি পাবে।

(৪) আগেরবার মূলায়ম যত খারাপ (গত লোকসভায় কেবল বৌমা, ভাই-ভাতিজা, নিজেকে নিয়ে ৫ জন), করেছেন, তার থেকে ভাল করে ৮০ মধ্যে

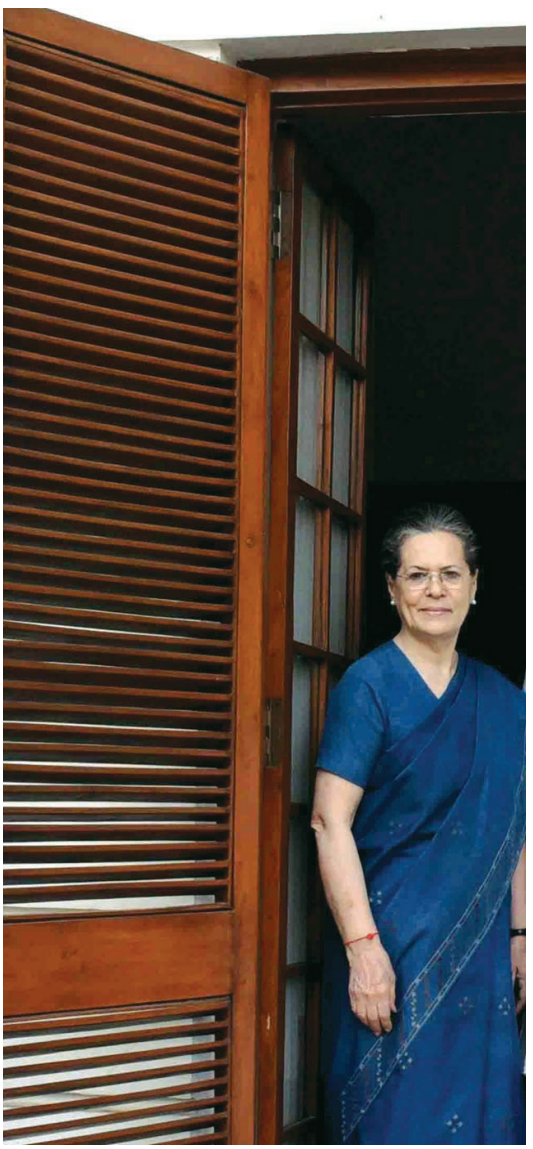

৩০ তো পাবেনই।

(৫) আর মহীরুহ কংগ্রেসের সভানেত্রী ও যুবরাজ ২০১৪-তে পেয়েছিলেন ৫৪২-এ মাত্র ৪৪। বিরোধী দল হতে পারেননি। সে কলঙ্ক মুছে তারা নিদেন পক্ষে সব রাজ্য থেকে (৩৩টি) ১টি করে আসন বাড়িয়ে ৮০ ছুঁয়ে ফেলবে।

(৬) এবার রইল 'ফলসা ব্রিগেড'। তিনি (দিদি) যে ১৮ দল বলছেন উল্লেখিত এই কটি দলই ফলের মধ্যে যেমন— আম, কাঁঠাল, আপেল বেদানা ইত্যাদি মান্যতা পায় এরাও তাই। বাকি যারা করমচা, আঁশফল, গাব, আমড়া বা ফলসা গোত্রের

তাদের পাতে দেওয়া যায় না। ক্ষমতা দখলের একটা কল্পিত পটচিত্র : (১) তৃণমূল-৪০, (২) লালুজী (জোট-সহ)-৩০, (৩) এআইএডিএমকে-৩০, (৪) মুলায়ম অখিলেশ-৩০, (৫) দুর্নীতির পাকাপোক্ত প্রতিষ্ঠানীকরণের পত্তনীদার কংগ্রেস-৮০। তাহলে কত দাঁড়াল? হ্যাঁ, সংখ্যাটা ২১০, কেজরিওয়াল আর ফলসা ব্রিগেড নিয়ে ধরুন আরও ২০, এর মধ্যে বাদ পড়ে যাওয়া সাংসদ বিধায়কদের টিকিট দিয়ে টাকা হজম করায় অভিযুক্ত মায়াবতীর ১০টি অবতার সমাজবাদী জোট হওয়ায় গুনতিতে দিদি আলাদা ধরেছেন। অর্থাৎ ২৪০ হয়ে গেল। ক্ষমতার গন্ধে বিজেডি, এনসিপি চাইকি আরও কেউ কেউ দল ছুট হবে। ৩০টা জুটলেই ২৭২! কিন্তু কংগ্রেস ৮০ হলে দিদি কীভাবে প্রধানমন্ত্রী হবেন? ঠিক যেমনভাবে দেবগৌড়া, গুজরাল হয়েছিলেন। ভুললে হবে না। তখন যদি বিজেপিকে ঠেকাতে এটা হয়, এখন কেন নয়? কুঁকড়ে যাবে কংগ্রেস, দিদি হবেন ভারতশ্বেরী। হায়! সে সুদিন হয়তো আমাদের ধরা দেবে না।

ইতিমধ্যে কয়েকটি সর্বোনেশে কাণ্ড ঘটে গেছে।

(১) নীতীশ কুমার সদলবলে এনডিএ-তে ফিরেছেন। ফল লালুর সিট ১০ হলে নেহাৎ বরাত জোর। (২) এআইএডিএমকে এনডিএ-তে আসার অপেক্ষায়, ফল ৩০টি সিট বিজেপির দিকে চলে আসায় হাতে রইল শূন্য। (৩) সদ্য ইউপি বিধানসভা নির্বাচনে মুলায়ম ৪৯ আসন পেয়েছেন। দেশে যুগান্তকারী রাজনৈতিক কেলেঙ্কারী না ঘটলে (যে আশা দুরাশা) তিনিও ১০ পেরোতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। (৪) মায়াবতীর ভোট ছিনতাই হয়ে গেছে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাতে গিয়ে। গত লোকসভার মতো তিনি সম্ভবত এবারও শূন্য হাতে ফিরবেন। খবর অনুযায়ী তিনি লালুর ২৭ আগস্টের সভা বয়কট করেছেন। (৫) আর কংগ্রেস! দিদির হিসেব মিলিয়ে আকাশ থেকে ৮০টি সিট পেলেও দিদির আশা পূরণ হবে না।

পরিবর্তিত হিসেবটা এরকম— লালু ১০, এআইএডিএমকে ০, মুলায়ম ১০, মায়াবতী ০, তৃণমূল ৪০, কংগ্রেস ৮০ মোট ১৪০। ক্ষমতা লেহনকারী ফলসা ব্রিগেড এ অবস্থায় ফিরেও তাকাবে না। এনসিপি, বিজেডি কাকে সমর্থন করবে তা ২০১৯-এর ফলাফল বলবে। উপরিউক্ত ১৪০ বাদ দিলে লোকসভায় আসন পড়ে থাকবে ৪০২টি। হতমান বিপ্লবীদের গোটা দশেক ও অন্যান্যদের এক ডজন ধরে নিলে বিজেপির আসনসংখ্যা হওয়া উচিত ৩৮০। দিদি হয়তো এই সংখ্যা মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁর হঠাৎ মোদীকে পছন্দ হয়েছে অমিত শাহকে মন্দ লাগছে। একেই বলে মোহমুদগর।

এই লেখার সময় খবর এল 'তিন তালাক' সর্বোচ্চ আদলত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। নির্যাতিত মুসলমান মহিলাদের পক্ষে জীবন-মরণের এই রায়ে সবাই খুশি হলেও দিদির মন মেঘাচ্ছন্ন। তিনি তো মামলাটির শুনানি শুরু হওয়ার আগেই মোল্লাদের হাতে রাখতে 'তিন তালাক' চালু রাখার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতেও পারেননি দেশের ৯ কোটি মুসলমান মহিলা অত্যাচারী স্বামী ও মোল্লাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে কী আকুল আগ্রহে এই রায়ের জন্য দিন গুণছেন। মোদী সরকারের তরফে তিন তালাক বাতিলের পক্ষে হলফনামা দেওয়ার মুসলমান মহিলারা দুহাতে তাকে আশীর্বাদ করেছেন।

যাইহোক, উপরিউক্ত অনুমান নির্ভর আলোচনায় এটা নিশ্চিত দিদির ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে না। দেশও বেঁচে যাবে এমন একজন অসংবেদনশীল শুধুমাত্র ভোট লোলুপ সাম্প্রদায়িক নেত্রীর খপ্পর থেকে। তিনি আবর্তিত হবেন তাঁর দাগি শাকরেদদের বৃত্তে কেননা নির্বাচকমণ্ডলী এর বিপরীতে দেখবে রাষ্ট্রহিতে সমর্পিত এক ব্যক্তিস্বার্থহীন, নিষ্কলঙ্ক পুরুষ নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে। ■

দুর্নীতিগ্রস্ত ও দেশবিরোধীদের মহাজোট

হুরিয়ত নেতার সঙ্গে কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আয়ারের গোপন বৈঠক।

অভিমন্যু গুহ

দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দেশদ্রোহীদের এমন ডেডলি কম্বিনেশন চট করে দেখা যায় না, যেমনটা দেখা যাচ্ছে মোদী-বিরোধী মহাজোটে। এর নেতৃত্বে রয়েছে দু'টি বিলুপ্ত প্রজাতির সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। একটির নাম কংগ্রেস, দুর্নীতিতে নোবেল পুরস্কার চালু থাকলে এটা তাদেরই পাওনা ছিল। অন্য দলটির নাম সিপিএম, দেশের খেয়েপরে দেশেরই দাড়ি ওপড়ানো যাদের রক্তে-মজ্জায়। আর আছে গোটা কতক আঞ্চলিক দল। যেমন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, আর্থিক দুর্নীতি এবং জেহাদি যোগে তাদের কর্মপন্থা সিপিএমকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। আছেন দুর্নীতি-শিরোমণি বিহার পুঙ্গব লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর দল আর জে ডি। এছাড়াও টিমটিম করে টিকে রয়েছেন শ্রীমতী মায়াবতী। আজ তিনি প্রায় অস্তিত্বহীন কিন্তু এককালে দলিত সমাজকে নিয়ে যথেচ্ছ রাজনীতি করেছেন, আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়েছেন।

বর্তমান ভারতবর্ষে এঁরাই হচ্ছেন মাথাব্যথা। মাঝেমধ্যেই কান পাতলে শোনা যায় ষোল দল-বিশ দলের মোদী বিরোধী মহাজোট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘোঁটটা এই পাঁচ দলেরই। এরা অন্য দলগুলির কোলে ঝুলে পড়ে। কিন্তু তাতেও লাভের লাভ কিছু নেই। নীতীশ সঙ্গ ছেড়েছেন। তাতে কী! সঙ্গীবিহীন শরদ যাদব তো আছেন। তাঁকে নিয়েই ঘোঁট-বন্ধুদের এমন কাড়াকাড়ি, সাতের দশকের ময়দানে প্লেয়ার রিক্রুটমেন্টকেও হার মানায়। শরদ পাওয়ারও এদের সঙ্গ ছাড়বো ছাড়বো করছেন, তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার এডিএমকে-র দুই বিবদমান গোষ্ঠী এক হয়ে আর ঘোঁটের ধার-পাশ মাড়াচ্ছেন না। সব মিলিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত আর দেশদ্রোহীদের ভাগ্যে এমন দুর্দিন আর সাম্প্রতিক অতীতে আসেনি। এ সবেরই মূলে রয়েছে একটি মানুষ। যাঁকে নিয়ে মহাঘোঁটের সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা। তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদী। চীনের হম্বি-তম্বি দেখে যে ঘোঁটওয়ালাদের উল্লাসের বাঁধন আর সামলানো যাচ্ছিল না, যে দেশদ্রোহীরা ভারতের কূটনৈতিক সৌজন্যকে দুর্বলতা ভেবে ভুল করেছিল, চীনের শান্তিবার্তা তাদের কাছে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-রও বেশি কিছু। এই দেশদ্রোহী লুটেরাদের পরিচয় দেশের নাগরিকদের সামনে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। ভোটের ময়দানের এরা বিলুপ্ত প্রজাতি। ব্যতিক্রমী মমতা স্রেফ গায়ের জোরে টিকে আছেন। তাঁর আমলে ভোট রিগিং সিপিএমকেও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। মোদী বিরোধিতাটা এদের কেবল অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নয়, বিদেশিদের এজেন্ট হিসেবে কাজেরও একটা অঙ্গ।

এ ব্যাপারে সিপিএমের দায় সবচেয়ে বেশি। কারণ মোদী তথা বিজেপি ক্ষমতায়

থাকলে কিংবা দেশজুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে তাদের মুখোশ খুলে যাবে, দেশদ্রোহিতার নগ্নরূপ দেশবাসী দেখতে পাবেন। সিপিএমে এখন দু'টো লবি। কেরল লবি ও বাংলা লবি। প্রকাশ কারাট গোষ্ঠীর সৌজন্যে কেরল লবি বরাবরই শক্তিশালী। এখন তো বাংলায় পার্টিটারই প্রায় অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে পার্টি কেরলে সরকারে। সেই কারণে বাংলা লবিকে এখন আর কেউ পোঁছে না। বাংলালবির মধ্যমণি সীতারাম ইয়েচুরির দাবি ছিল বিজেপির শাসনকে ফ্যাসিস্ট শাসনের সমতুল ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু কে কবে দেখেছে, 'ফ্যাসিস্ট' শাসনে 'ফ্যাসিস্ট'রাই বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে? কেরলে স্বয়ংসেবকদের হত্যার কথা সকলেরই জানা। ফলে কারাটপন্থীরা বিজেপি জমানাকে ফ্যাসিস্ট শাসন বলতে রাজি হনই বা কী করে? ফলে কারাটপন্থী আর সীতারাম-পন্থীদের লড়াই বেঁধেছে।

এই কারণেই বেচারা সীতারামের আর তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যসভায় যাওয়া হলো না। সিপিএম ভালোভাবেই জানে, বিজেপি বিরোধিতা না করলে চীন-পাকিস্তান-সহ অন্যান্য বিরোধী রাষ্ট্রের সহানুভূতি তাদের কপালে জুটবে না, আর তা না জুটলে পার্টিটার অস্তিত্বই উবে যাবে। ত্রিপুরায় ইতিমধ্যেই বিজেপি-র আগ্রাসনে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে সিপিএমের ভিত। অগত্যা সোনিয়ার পদতলে লুটিয়ে পড়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই।

সিপিএম অবশ্য একটা কাজ এতদিনে সফল ভাবে করতে পেরেছে। সেটা হলো তাদের দেশবিরোধিতায় কংগ্রেসকেও শামিল করা। নেহরু থেকে ইন্দিরা— এঁদের বহু পদক্ষেপ হয়তো দেশের ক্ষতির কারণ হয়েছে কিন্তু পররাষ্ট্রের দালালির কাজ এঁরা করেননি। যে কাজটি এঁদেরই বংশধর রাহুলের গান্ধী করে দেখালেন। যে আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ রাতারাতি কার্যকর করেছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, সেই সংসদ আক্রমণকারীর মৃত্যুব্যার্ষিকী পালন কেন করতে দেওয়া হলো না— রাহুলের এনিয়ে মাওবাদী সিপিএমের সঙ্গে গলা মেলানোর কথা দেশের মানুষ জীবনে ভুলবেন না। ইন্দিরা থেকে রাজীব ক্ষমতা থেকে এঁরাও সরেছেন আবার ফিরেও এসেছেন কিন্তু রাহুলের মতো দেশদ্রোহিতার কাজ করেননি। এতো গেল নেহরু-গান্ধী পরিবারের কথা। কংগ্রেসের বড়ো নেতা সলমন খুরশিদ বা কপিল সিব্বাল; সুপ্রিম কোর্টে লাভ-জেহাদ মামলায় আই এস পন্থী জাহানের হয়ে ওকালতি কিংবা তিন-তালাক মামলায় তালাকের পক্ষে সওয়াল—

মোদীর স্বচ্ছ ভারতে মমতা ব্যানার্জি-লালুপ্রসাদ কিংবা মায়াবতীর মতো চরম দুর্নীতিগ্রস্তদের কোনো ঠাঁই নেই। সুতরাং বিজেপি বিরোধিতা করা ছাড়া এদের আর কোনো উপায়ও নেই। একারণেই দেশজুড়ে বিজেপি বিরোধী মহাজোটের জিগির তোলার চেষ্টা।

জে এন ইউ-তে দেশবিরোধী শ্লোগানের সমর্থকদের সঙ্গে ইয়েচুরি।

জে এন ইউ-তে দেশবিরোধী শ্লোগানের সমর্থকদের সঙ্গে রাহুল গান্ধী।

এঁরা দু'জন কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক নগ্ন দেশবিরোধীরূপ জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

মোদী সরকারের সবচেয়ে বড়ো অ্যাজেন্ডা হলো দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ভারত গঠন। আর এই ভারতে মমতা ব্যানার্জি-লালুপ্রসাদ কিংবা মায়াবতীর মতো চরম দুর্নীতিগ্রস্তদের কোনো ঠাঁই নেই। সুতরাং বিজেপি বিরোধিতা করা ছাড়া এদেরও আর কোনো উপায় নেই। আর মমতার ক্ষমতা কায়েমের বড়ো সহায়ক মুসলমানরা। এদেরকে তুষ্ট করতে তিন তালাক সমর্থন থেকে জেহাদ— তৃণমূল নেত্রী দেশদ্রোহিতার কোনো পদক্ষেপেই আর পিছপা নন। সুতরাং বিজেপি তো তার শত্রু হবেনই। সুতরাং দেশজুড়ে বিজেপি বিরোধী মহাজোটের যে জিগির তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তা কেবল দেশদ্রোহী ও দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু কায়েমি স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। যে কারণে নীতীশ কুমার, শরদ পাওয়ার কিংবা তামিলনাড়ুর এডিএমকে গোষ্ঠীর মতো প্রকৃত রাজনীতিবিদরা এদের পাশ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন বা দাঁড়াবেন বলে ভাবছেন। ক্রমে ক্রমে দেখা যাবে দেশবাসীরাও এদের ত্যাজ্য করেছেন। যেমন কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ও মায়াবতী হয়েছে, লালু-মমতার দিনও ঘনিয়ে আসছে।

পুনশ্চ : এই আলোচনায় আরেক মহান দুর্নীতিগ্রস্ত ও দেশদ্রোহীর নাম করা হলো না। কারণ তিনি বহুদিনই নিরুদ্দেশে। তিনি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দুর্নীতিগ্রস্ত ও দেশবিরোধীদের মহাজোটের অন্যতম কারিগরের এই 'য পলায়তি, স জীবতি' নীতিই দেখিয়ে দিচ্ছে জোটের ভবিষ্যত। ■

এই সময়

বোতলে চিঠি

গাজার সমুদ্রে মাছ ধরার সময় জিহাদ আল সুলতান বোতলে বন্দি একটি চিঠি আবিষ্কার করলেন। পত্রলেখক বেথানি রাইট এবং

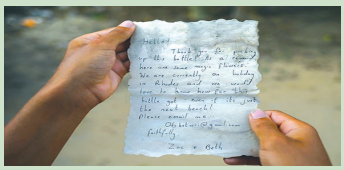

জ্যাক ম্যারিনার। জানা গেছে, গ্রীসে ছুটি কাটানোর সময় ওরা বোতলে চিঠি ভরে সমুদ্রে ফেলেছিলেন। গ্রীসের সেই চিঠি পাওয়া গেল গাজায়!

সন্তানসম

নিউইয়র্কের বাসিন্দা এলেন ফ্রেউটার্স তাঁর পোষা বেড়ালদের জন্য তিন লক্ষ ডলারের

সম্পত্তি রেখে গেছেন। ৮৮ বছর বয়েসে তিনি মারা যান। কোনও উত্তরাধিকারী না থাকার ফলে তিনি বিপুল সম্পত্তি সন্তানসম পোষ্যদের দিয়ে গেছেন।

ছাদে গাড়ি

মহিলাকে একাধিকবার বারণ করা সত্ত্বেও তিনি শোনেননি। ভুল জায়গায় গাড়ি রাখার

ফলে অন্যের অসুবিধে হচ্ছিল। শাস্তিস্বরূপ নিরাপত্তারক্ষীরা গাড়িটি সিকিউরিটি স্টেশনের ছাদে তুলে দিয়েছিলেন। পরে মহিলার অনুরোধে নামিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটা চীনের।

মালদা বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে রক্তদান শিবির

প্রতিবছরের মতো এবছরও গত ১১ আগস্ট মালদহ জেলার বাচামারী গভ: কলোনিস্থিত বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ প্রলয় কুমার দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধি দল, শিশু মন্দিরের সভাপতি, অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দ, প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা। শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য শহিদ

ক্ষুদিরাম বসু সম্বন্ধে আলোকপাত করেন এবং ১১ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সকলকে স্বদেশী সপ্তাহ পালনের আবেদন জানান। এরপর চলে রক্তদান শিবির। মোট ৬২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রধান আচার্য রক্তদানকারী সকলকে জনসেবা তথা লোককল্যাণকর কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পুরুলিয়ায় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের রাখীবন্ধন উৎসব

পুরুলিয়া জেলা নগর সমিতির ব্যবস্থাপনায় ও নিবেদিতা ছাত্রী নিবাসের সহযোগিতায় গত ৭ আগস্ট সন্ধ্যায় পুরুলিয়া রাজগেড়িয়া ধর্মশালায় রাখীবন্ধন উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীদের নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবী লক্ষ্মীনারায়ণজী সুলতানিয়া কল্যাণ আশ্রমের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান বক্তা সংগঠনের ক্ষেত্রীয় শ্রদ্ধা জাগরণ প্রমুখ অশোক জানা কল্যাণ আশ্রমের কাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবাপন্ন নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বনবাসীদের মধ্যে আশ্রমের কাজ কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানকার জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে রাষ্ট্রীয় একতা রাষ্ট্রীয় ভাবধারা জাগরণের কাজ কীভাবে করছে তার কথা তুলে ধরেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রান্ত নগর সম্পর্ক প্রমুখ অনিল সাঁতরা, পুরুলিয়া নগর সমিতির সভাপতি মোহন খৈতান-সহ প্রায় ২০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার ১৫০তম বর্ষ উদ্‌যাপন

গত ১৩ আগস্ট সোনারপুর ব্লকের অন্তর্গত আড়াপাঁচ মোড়ে অবস্থিত রসিলা আশ্রমে, ভগিনী নিবেদিতা সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি- সোনারপুর গ্রামীণ শাখার

এই সময়

বোনাস মা

'আমার মেয়েই যে শুধু তার বোনাস মমকে ভালোবাসে, তা নয়, আমিও ভালোবাসি'।

কথাটা ওকলোহামা নিবাসী হ্যালি বুথের। 'বোনাস মম' অর্থাৎ হ্যালির ছোট্ট মেয়ের সৎ মা। সম্প্রতি হ্যালি ফেসবুকে এই মন্তব্যটি করেছিলেন। ভাইরাল হয়ে গেছে তার পোস্ট।

বস্তায় টাকা

চীনের এক মহিলা গাড়ির দাম বাবদ ১, ৩০,০০০ ইউয়ান (১৯,০০০ ডলার) নগদে দিয়েছেন। তার সঙ্গে ছিল চারটি বস্তা। প্রতিটি ১ ইউয়ান কারেন্সি নোটে ভর্তি। শোরুমের কুড়িজন কর্মী আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় নোট গুণতে সমর্থ হন।

ভাসমান স্কুল

বন্যায় ডুবে গেছে স্কুল। তাই অসমের শিক্ষকেরা ভাসমান স্কুল চালু করলেন। স্কুল

বসবে নৌকোয়। প্রতিদিন বিকেলে দু' ঘণ্টা করে ক্লাস হবে। ক্লাস শুরু করার আগে স্কুলের নৌকোই বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসবে ছাত্রদের।

সমাবেশ -সমাচার

উদ্যোগে 'ভগিনী নিবেদিতা নারী সশক্তিকরণের মূর্তরূপ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে সোনারপুর ব্লকের ১৫টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-প্রতিযোগীরা প্রথমে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে আবৃত্তি (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী), রচনা (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী), চিত্রাঙ্কন, প্রশ্নোত্তর পর্ব (নব ও দশম)-তে অংশগ্রহণ করে। সেখান থেকে নির্বাচিত ১ম-২য়-৩য় স্থানাধিকারী প্রতিযোগীরা ১৩ আগস্টে অনুষ্ঠিত (রসিলা আশ্রম, আড়াপাঁচমোড়) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে (৭টি বিদ্যালয়)। ওই অনুষ্ঠানে প্রতিটি বিভাগ থেকে যারা নির্বাচিত (১ম, ২য়, ৩য়) হয়েছে তাদের ২৭ আগস্ট 'জন্মাষ্টমী' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে। বিজয়ী প্রতিযোগীরা কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কে ৭ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং বিশিষ্ট অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবে।

সমবেত গীত-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভগিনী নিবেদিতার চিত্রে পুষ্প অর্পণ করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন রসিলা আশ্রমের অধ্যক্ষ সুচারামজী এবং গুণধর হালদার। সুভাষিত পাঠ করেন ভবতোষ দাস।

ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী রাষ্ট্রভারতী সম্মানে ভূষিত

গত ১৩ আগস্ট কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক সংস্থা 'ফ্রেন্ডস্ অব কলকাতা'-র উদ্যোগে স্বাধীনতার ৭০ বছর পূর্তিতে 'রাষ্ট্রভারতী সম্মান'-এর প্রথম সম্মান ভারতীয়

মনীষার অনন্য সাধক, বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক, প্রখর জাতীয়তাবাদী, ওজস্বী বক্তা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠীকে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। ড. ত্রিপাঠীকে সম্মানে ভূষিত করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে সমাজ সেবা ভারতীর স্বাস্থ্য শিবির

গত ২০ জুলাই দুর্গাপুর সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ইছাপুর সেবা ভবনে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কল্যাণী মেডিকেল কলেজ-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ডাক্তারবাবুরা এই শিবিরে যোগদান করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মোট ১২ জন ডাক্তার যাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা। গ্রামের বিভিন্ন পরিবারে ডাক্তারদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

মোট ১৮০ জন রুগির চিকিৎসা হয়। রক্তপরীক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়। সমাজ সেবা

এই সময়

অন্নপূর্ণার হেঁশেল

উদ্দেশ্য গরিব মানুষকে সস্তায় খাবার দেওয়া। তাই রাজস্থান সরকার অন্নপূর্ণা কিচেন প্রকল্পের পরিধি অনেকটা বাড়িয়ে

দিল। আগে এই প্রকল্পে সরকারি হাসপাতালের রোগীদের সস্তায় পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হোত। এখন থেকে সাধারণ গরিব মানুষও পাবেন।

ফ্ল্যাগ মিটিং

১৮ মাস পর ভারত এবং পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ মিটিং হয়ে গেল পুঞ্চের চাক্কন দা বাগে। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে বলা হয়, পাক

সেনার বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের ব্যাটালিয়ান-কম্যান্ডার পর্যায়ের ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে।

দার্জিলিংয়ে বিস্ফোরণ

সর্বদলীয় বৈঠকের আর বেশি দেরি নেই। ঠিক এই সময় দার্জিলিংয়ের সুখিয়া-

পোখরিতে বিস্ফোরণ হলো। কিছুদিন আগে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙেও এই ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে কেউ হতাহত না হলেও উদ্বেগ পাহাড়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে।

সমাবেশ -সমাচার

ভারতীর (প.ব.) সভাপতি ভি.কে. তেওয়ারি (প্রফেসর IIT, Khargpur) এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। রোগীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনমতো ওষুধ সরবরাহ করা হয়। সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানান সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মলয় কালী।

রাখীবন্ধনে সোনারপুর গ্রামীণ শাখা

রাখীবন্ধন ভারতীয় জাতীয় সম্প্রীতির উৎসব, ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের উৎসব। ওইদিন দিদি ও বোনেরা তাদের ভাই ও দাদাদের রাখী নামক একটি পবিত্র সৌভ্রাতৃত্বের সুতোর বন্ধনে বাঁধেন। ইংরেজির ৭ আগস্ট সকালে সোনারপুর গ্রামীণ শাখা রাখীবন্ধনের সূচনা করে সোনারপুর থানা থেকে। প্রথম রাখীটি পরান সোনারপুর গ্রামীণ শাখার সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল থানায় উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে।

অতঃপর উপস্থিত সকল কর্মচারীদের রাখী পরান ও মিষ্টিমুখ করান সংগঠনের সহ সভাপতি নিত্যানন্দ সরকার ও সাংগঠনিক সম্পাদক শেখর মণ্ডল। সোনারপুর থানার পর সোনারপুর জি.আর.পি. থানায় উপস্থিত সকল আধিকারিক ও কর্মচারীদের রাখী পরানো ও মিষ্টি পরিবেশন করা হয়, রাখী পরানো হয় সোনারপুর নার্সিং হোমের সকলকে, সোনারপুর 'বীণাপাণী হিন্দু মিলন মন্দিরে' উপস্থিত হয়ে সেখানে নৃত্য ও সঙ্গীতকলা বিশারদ বরুণ রায় এবং উপস্থিত অন্য শিল্পী ও সকলকে রাখী পরিয়ে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এরপর ঘাসিয়ারা 'সত্যরানি মেমোরিয়াল নার্সিং হোম'-এ পৌঁছে ডাঃ হরসিত সরকার-সহ সকল কর্মীকে রাখী পরিয়ে মিষ্টি মুখ করানো হয়। অতঃপর পঞ্জাবি 'রসিলা আশ্রমে' পূজ্যপাদ গুরুজী-সহ উপস্থিত সকলকে রাখী পরানো ও মিষ্টি মুখ করিয়ে শান্তি মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে রাখী পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

শুভ জন্মাষ্টমী উৎসব

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন সমিতির যৌথ পরিচালনায় হুগলী জেলার নেত্রগোড়ার অরুণাশ্রম প্রাঙ্গণে ১৪ আগস্ট সাড়ম্বরে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হলো। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অভিজিত রায়চৌধুরী, রেবা দাস প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী প্রতিভা দে সরকার।

অপরাহ্নে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় ২০ জন শিশু কৃষ্ণ সেজে এসে সকলকে চমকিত করে। প্রায় ৬০০ ভক্ত কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুবের প্রসাদ জয়সোয়াল ও সুশীল ভট্টাচার্য। সর্বশেষে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ননীগোপাল দাস।

প্যাটেলের জয়ে কংগ্রেসের নিরাশা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা নেই

অতিথি কলম

নলিন মেহতা

আহমেদ প্যাটেলের নিন্দুকরা বলে থাকে যে গুজরাটে তিন কিসিমের প্যাটেলের বসবাস। যেমন কদভা প্যাটেল, লিউভা প্যাটেল আর আহমেদ প্যাটেল। এর মধ্যে কিছুটা বিদ্রূপ বা অতিকথন থাকলেও যথেষ্ট রাজনৈতিক খোঁচা অবশ্যই আছে। এই খোঁচাটি হচ্ছে তাঁর যেন তেন প্রকারে ভোট জোটানোর কাজটি প্রয়োজনে অপকর্মের মাধ্যমে হলেও সফল করার অমোঘ দক্ষতা সম্পর্কে। একই সঙ্গে অত্যন্ত মসৃণভাবে কংগ্রেস সভানেত্রীর সিংহাসনটি পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাঁর অনস্বীকার্য পারদর্শিতার প্রকারন্তরে প্রশংসা। কী সেই কুশলতা যার জোরে ১৯৭৭ থেকে আজ অবধি ৩০ বছরের অধিককাল

(১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ লোকসভার সাংসদ এবং ১৯৯৩ থেকে একাদিক্রমে টানা রাজ্যসভার সদস্য) সংসদের গদি ধরে রাখা যায়? এর ফলে অন্তত ২০০১ থেকে কংগ্রেস কর্ত্রী সোনিয়ার যাবতীয় রাজনৈতিক চাল প্রধানত তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। অবশ্যই আমেদ প্যাটেলের উপর্যুপরি পাঁচ-পাঁচবারের রাজ্যসভার নির্বাচনে জয় ঠেকাতে বিজেপি সর্বশক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হওয়ায় ইদানীংকালে নির্বাচন যুদ্ধে পরাজয় অভ্যেস করে ফেলা কংগ্রেসের সাময়িক মুখ রক্ষা অবশ্য হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই জয় কি কংগ্রেসের পক্ষে আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়ানোর একটি সম্ভাবনাময় সূচনা নাকি বৃদ্ধতন্ত্রের ক্ষেত্রে কিছুটা অক্সিজেন জোগানো মাত্র। একই সঙ্গে আপাতভাবে গুরুত্বহীন রাজ্যসভার একটি নির্বাচন নিয়ে যে তুমুল উত্তেজনা ঘটল যার নজির অতীতে বিরল। তাই এই মর্যাদার লড়াইয়ের দিকে পরিস্থিতিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কি বাস্তবিক তেমন তাৎপর্য ছিল?

প্রথমত, উভয় রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই এই নির্বাচনটিকে কেবলমাত্র জয় পরাজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যকে এমন প্রকট করে তুলল, তাকে এমন জটিল আঙ্কিক সমীকরণের দিকে ঠেলে দিল যে শেষমেষ কিন্তু নৈতিকতার খাতিরে জয়ী হলো নির্বাচন কমিশন। ইতিহাসের পরিহাসে ২১ বছর আগে শঙ্কর সিংহ বাঘেলার বিজেপি ছেড়ে বেরোবার প্রথম বিদ্রোহের সময়কার ঘটনাবলীর প্রায় পুনরাবৃত্তি করে কংগ্রেস এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল যখন গান্ধীনগরের বাতাসকে দূষিত করে বিধায়ক পিছু দাম নাকি উঠে গেল ১৫ কোটি টাকায়।

> “দিল্লি পুরনিগমগুলির নির্বাচনে নির্মম পরাজয়ের পর নির্বাচন আয়োগের ওপর দোষ চাপানোর কেজরিওয়ালী ছ্যাবলামো বা উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ফলাফলে প্রায় মুছে যাওয়ার পর মায়াবতীর একই বিষোদ্গার— হেরে গেলেই ‘বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরার’ মতো নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করার কু-অভ্যাস— এবার অন্তত বরাবরের মতো বন্ধ হবে আশা করা যায়।”

ঠিক ১৯৯৫ সালে বাঘেলা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে খাজুরহো যাত্রার মতো এবার কংগ্রেসের ৪৪ জন বিধায়ক নিয়ে কর্ণাটকের 'ইগলটন বিশ্রামাগারে' অভিযান যদি শক্তি প্রদর্শনের নিরিখে একই গোত্রের হয়, তবুও একেবারে সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই আয়কর আধিকারিকদের কংগ্রেস মন্ত্রীর বাড়িতে তাল্লাশি চালানোর বিষয়টা অনেকের কাছেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাপটের অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটি তুলতে সাহায্য করছে। তবু বলতেই হবে, পরিস্থিতির একটা সম্মানজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নির্বাচন আয়োগ তার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান আরও শক্ত করল। সরকারের এক গুচ্ছ প্রবীণ মন্ত্রীদের আইনি যুক্তিজাল সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনার চিদাম্বরমের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের ঘোষিত অবস্থান, আলোচিত দুই দলছুট বিধায়ক নিশ্চিতভাবে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেছিলেন এই তথ্যকে মান্যতাদান। এতে গড়পড়তা ভারতীয়দের চোখে তাঁরা (কমিশন) অন্য উচ্চতায় চলে গেলেন। দিল্লি পুরনিগমগুলির নির্বাচনে নির্মম পরাজয়ের পর নির্বাচন আয়োগের ওপর দোষ চাপানোর কেজরিওয়ালী ছ্যাবলামো বা উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ফলাফলে প্রায় মুছে যাওয়ার পর মায়াবতীর একই বিষোদ্গার— হেরে গেলেই 'বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরার' মতো নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করার কু-অভ্যাস— এবার অন্তত বরাবরের মতো বন্ধ হবে আশা করা যায়।

একই সঙ্গে দুই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার এনডিএ জমানায় নিযুক্ত হয়েছেন, বিশেষ করে মুখ্য নির্বাচনী অধিকর্তা এ কে জোতি গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোদীর প্রধান সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। অতএব আর যায় কোথায়? এরা তো সরকারের হয়েই কাজ করবেন। তাই এটা পরিস্কার বলা দরকার শত অপবাদ সত্ত্বেও নির্বাচন আয়োগের এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সংবিধানানুগ প্রণালী ও তার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার আজ কতটা নিরপেক্ষ ও শক্তপোক্ত তাই আবার সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করল।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে চলে আশা রীতিই হলো কিছুটা গড়াপেটা ম্যাচ খেলা। তাই এই সূত্রে বিজেপিকে পুরাপুরি দায়ী করা যায় না যখন দুটি দলের মধ্যে সদস্যকেই নিয়ে তলে তলে আকছারই গোপন বোঝাপড়া চলতে থাকে। বিশেষ করে যখন কোনও বড় নেতার জয় পরজায় জড়িয়ে যায়। মোদী ও অমিত শাহের নির্বাচনী পাটীগণিত সব সময়ই অবিসংবাদিত ভাবে ফুল প্রুফ থাকে। কিন্তু রাজ্যসভা ভোটের ক্ষেত্রে রাজ্য অনুযায়ী বিধায়কদের ভোটের মূল্যমান ও প্রথম পছন্দ, দ্বিতীয় পছন্দের জটিল আবর্তে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ওই দুটি বিতর্কিত বাতিল ভোট ছাড়াই হয়তো প্যাটেল জয়ী হতে পারতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজেপির জয়ের (১ ভোটে) এত কাছাকাছি এসে যাওয়া যেখানে কংগ্রেসের তরফে এটি ছিল একটি নিরাপদ প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য গভীর সঙ্কেতবহ।

তৃতীয়ত, এই ফলাফল নিশ্চয়ই কংগ্রেসকে হাঁফ ছাড়বার সময় দেবে কিন্তু আসন্ন গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। নির্বাচনী হিসেব অনুযায়ী ২০১৭ সালের নির্বাচন দু' দশক পরে গুজরাটে ক্ষমতায় ফেরার জন্য কংগ্রেসের কাছে সেরা সুযোগ। ২০০২ সাল থেকে ২০১২ যে সময়টা গুজরাটে মোদী যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে, তখনও ক্ষমতা হারালেও প্রত্যেকটি নির্বাচনে তারা ধারাবাহিকভাবে ৪০ শতাংশ ভোট নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর মোদীর সূক্ষ্ম কারিগরির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বিজেপির চিরাচরিত প্যাটেল ভোট ব্যাঙ্কের মধ্যে টেনশন দানা পাকাতে থাকে যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হার্দিক প্যাটেলের সংরক্ষণ আন্দোলনের মধ্যে আমরা দেখেছি।

এছাড়াও জিগনেশ মেভানির দলিত সম্প্রদায় ও অল্পেশ ফাকোরের OBC গোষ্ঠীকে নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন দানা পাকিয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজেপি প্রত্যেকবার তার কৌশলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন আনলেও কংগ্রেস কিন্তু থেকে গেছে সেই ২০০২ সালের অবস্থানে। এখানকার সর্বোচ্চ রাজ্য নেতৃত্বের ভার মূলত ৫ নেতার একটি বৃত্তের মধ্যেই আবদ্ধ রয়েছে। এই পঞ্চরত্ন হলেন বাঘেলা, ভরত সিংহ, সোলাঙ্কি, সিদ্ধার্থ প্যাটেল, অর্জুন মদওয়াদিয়া ও শক্তিবর্মন গোহিল। এর মধ্যে বাঘেলার সাম্প্রতিক বিদ্রোহ দলকে আরও দুর্বল করে তুলবে। এই গোষ্ঠীও মূলত দ্বিধাবিভক্ত। তাই যতক্ষণ নবীন ও উৎসাহী নেতৃত্ব উঠে না আসছে ততদিন কংগ্রেস আক্ষরিক অর্থেই দিশাহীন একটি দলই থাকবে।

উল্টো দিকে নির্বাচনী জয় ছিনিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে বিজেপি নেতৃত্ব অত্যন্ত কঠোর। ২০১৬-এর আগস্টে অপ্রিয় কিছু খবর থাকায় মুখ্যমন্ত্রী আনন্দীবেন প্যাটেলকে সরিয়ে বিজয় রূপানীকে আনতে নেতৃত্ব দু'বার ভাবেনি। এরই সঙ্গে গত ২ বছরে তিন তিন জন রাজ্য সভাপতি হয়েছেন যথা— আর সি ফালদু, রূপানী স্বয়ং ও জিজু ভাগানী। পরিস্থিতি সাপেক্ষে এই ক্ষিপ্র রাজনৈতিক পদক্ষেপের কারণেই ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল আবার হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। শুধু তাই নয় যে উনা অঞ্চল কিছুকাল আগে তথাকথিত দলিত নিগ্রহের জন্য শিরোনামে উঠে এসেছিল, সেই 'উনাতেও' দল জয় হাসিল করে নেয়।

চতুর্থত, রাজ্যসভা নির্বাচনের মহাগুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন সম্মানের প্রশ্ন ভয়ঙ্কর ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল ঠিক তখনই দলীয় সহসভাপতি রাহুল গান্ধীর অনুপস্থিতি সকলের নজরে পড়েছে। কংগ্রেসের বৃদ্ধতন্ত্র এই জয়ে কিছুটা উল্লসিত বোধ করছেন কেননা তাদের জমানার লোক জিতেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বৃদ্ধেরা কেউই দলকে ভোট এনে দিতে পারেন না। তাদের মধ্যে যে চুম্বক শক্তি নেই। আর রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব এ পর্যন্ত দলকে কোনো সাফল্যের মুখই দেখাতে পারেনি। তাই দল এখনও নতুন ভাবনা ও প্রাণবন্ত আত্মপরিচয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই রাজ্যসভার ফলাফল এই তুমুল নিরাশা থেকে উত্তরণের কোনো রাস্তাই দেখাতে পারবে না। ■

চিঠিপত্র

২১-এর হুঙ্কার

২১ জুলাই ছিল তৃণমূলের কাছে শহিদ স্মরণের দিন। সেই সুবাদে কলকাতার ধর্মতলায় পেল্লায় এক মঞ্চ বাঁধাও হয়েছিল। হয়েছিল লক্ষাধিক লোকের জনসমাগমও। অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম এই জনসমাবেশকে জনসমুদ্র, গণঢেউ, জনপ্লাবন ইত্যাদির সঙ্গে করেছে তুলনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ওই জনসমুদ্রের জলে যে কত বেনোজল মিশে ছিল প্রচার মাধ্যমগুলি তার খবর করেনি কেন? শাসকদলের সমাবেশে লোক জড়ো করার একটাই সুবিধে, দলের নেতা-কর্মীরা অনিচ্ছুক জনগণকে মায় বিরোধীদলের সমর্থকদেরও ভয় দেখিয়ে, মারধোর করে বা প্রলুব্ধ করে সমাবেশকে জনসমুদ্রে পরিণত করার ক্ষমতা রাখে। তাদের উপর নেতৃত্বের এমনই নির্দেশ থাকে। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। তাছাড়া সমাবেশে আসা অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য ছিল অঢেল আয়োজন। জনসভাটি 'শহিদ স্মরণ'-এর উদ্দেশ্যে হলেও শহিদরা ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, স্মরণ ও মনন ছিল অনুপস্থিত। তাই সভাটি শহিদ স্মরণের সভা হলেও কার্যত তা পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক তরজা সমাবেশে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল 'সুপ্রিমো' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহিদ স্মরণের পরিবর্তে করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপি-র আদ্যশ্রাদ্ধ। তিনি বিজেপিকে শুধু ভারতছাড়া করারই ডাক দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি, ছুঁড়ে দিয়েছেন ২০১৯-য়েই 'বড়দা' বিদায়'-য়ের চ্যালেঞ্জও। তিনি বলেছেন— কয়েকটা গুণ্ডা মিলে দেশ চালাচ্ছে, ধূলিসাৎ করব বিজেপিকে, দেশছাড়া করবই। দুর্নীতি ঢাকতেই বিজেপি দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে, দেশে সুপার জরুরি অবস্থা চলছে ইত্যাদি আরও কত সাত সতেরো।

তবে কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি ও মোদী (বড়দা)-র বিরুদ্ধে যতই হুমকি, ধমকি, হুঙ্কার ছেড়ে আপনার ভাই-বেরাদরদের উজ্জীবিত, উত্তেজিত করুন না কেন, তারা বুঝে গিয়েছে— 'বড়দা' বিদায় নয়, 'দিদি' বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। তাই 'বড়দা' নয়, বিদায় হবে আপনার। আর সেই বিদায়-বাদ্যি বেজেও উঠেছে। তবে প্রশ্ন, এত টাকা আপনি পাবেন কোথায়? তবে কী সব নারদা-সারদার?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

গোরক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নোটিফিকেশন

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গোহত্যা ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক দুটি নোটিফিকেশন জারি করছেন। এ বিষয়ে স্বস্তিকা ৪০ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। কৃষিকাজ, গাড়ি টানা এবং দুধের প্রয়োজন ছাড়া গোরু ক্রয় বা বিক্রয় করা যাবে না। একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা সর্বাধিক দুটি গোরুর বেশি ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারবেন না। পঞ্চায়েতকেও যুক্ত করতে হবে। ক্রেতা, বিক্রেতার গোরুর প্রয়োজন আছে কিনা পঞ্চায়েত থেকে লিখিত নিতে হবে। পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব দেওয়া হবে ক্রেতা সত্যি কি হালের জন্য গোরু কিনছেন অথবা চাষের কাজে বা গাড়ি টানার জন্য ব্যবহার করছেন? নাকি অন্যত্র বিক্রি করে দিয়েছেন, তা পঞ্চায়েত থেকে দেখতে হবে। এবং পশু আধিকারিকের নিকট রিপোর্ট দিতে হবে। কোচবিহার জেলার যেসব হাটে গোরু বিক্রয় হয় সেসব হাট থেকে গোরুর দালালরা ১০/১২টি করে গোরু ক্রয় করে দিনহাটা এবং মুসলমান প্রধান এলাকা শুকটাবাড়ি নিয়ে যায়। তারপর সময় ও সুযোগ বুঝে বাংলাদেশ পাচার করে।

গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণার কথা বলতেই মুসলমান সমাজ যত না চিৎকার করছেন তার অধিক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল রে রে করে উঠছেন। রাজনৈতিক দলগুলো মুসলমান ভোট ব্যাঙ্ক করার লক্ষ্যে নিজেরা প্রকাশ্য রাস্তায় গোমাংস খেয়ে মেকি মুসলমান দরদি সাজছেন। গোমাংস ছাড়া বহু পশু আছে সেইসব পশুর মাংস খেতে আপত্তি কোথায়? গোমাংস উত্তেজক এবং নানাবিধ চর্মরোগের কারণ।

হিন্দুরা কচ্ছপের মাংস খেতে ভালবাসেন। সেই কচ্ছপ হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে। কই হিন্দুরা তো চিৎকার শুরু করে দেয়নি! কচ্ছপ নিষিদ্ধ হওয়াতে রাজনৈতিক দল ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল নীরব কেন? বৈধ বা অবৈধ সব কষাইখানা অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হোক। গোরুর মাংস রপ্তানি বন্ধ হলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় কোনো ছায়া পড়বে না। গোরু আমাদের জাতীয় সম্পদ। গোরক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। গোরক্ষা হলে সমাজ ও দেশরক্ষা পাবে। তাই যে কোনো মূল্যে গোরু পাচার ও হত্যা বন্ধ করা উচিত।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি খুললেই দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মোচ্ছব চলছে। কোথাও বোরখা পরা মুসলমান মহিলার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গেরুয়া ধুতি পরা হাতে বাঁশি, মাথায় চূড়া ৭/৮ বছরের বালক। কোথাও মাথায় টুপি দিয়ে মুসলমান যুবক এবং বোরখা পরে মুসলমান মহিলা গণেশ পূজা করছে। কোথাও গেরুয়াধারী হিন্দুসন্ন্যাসীর সঙ্গে দাঁড়ি টুপি পরিহিত মৌলবি সাহেব কোলাকুলি করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন, এতই যদি পিরিত থাকতো তাহলে দেশ ভাগ হলো কেন? কেন ১৯৪৬ সালে ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত তিন দিনে কলকাতা শহরে ২০০০০ হিন্দু নিহত হলো? অসংখ্য হিন্দুর বাড়ি পুড়লো।

কেন ঢাকা শহরে ওই সময় নিহত হিন্দুদের মৃতদেহ ট্রাক বোঝাই করে উয়ারি পাড়ায় পাঠানো হয়েছিল। এরপর অক্টোবর ৪৬-এ নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা দুটো জেলা তছনছ হয়েছিল। এড়য়োয়ার্ড সিম্পসনের রিপোর্টে বলা হয় এক অঞ্চলে ৩০০ এবং আর এক অঞ্চলে ৪০০ মহিলা ধর্ষিতা হয়েছিল। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৭/৮ স্থানে মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অসংখ্য হিন্দুর বাড়িঘর দগ্ধ হয়েছে। বহু হিন্দুর সম্পত্তি লুঠ হয়েছে। অনেক হিন্দু আহত হয়েছে। ওইসব দাঙ্গায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই সব মুসলমান নেতাদেরই দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে পত্রিকায় ফটো ছাপিয়ে সাধু সাজার চেষ্টা করছে। এখানে আমি মাত্র ২/৩ জনের নাম এবং তাদের অপকর্মের উদাহরণ তুলে ধরছি।

(১) হাজী নরুল ইসলাম— যার নেতৃত্বে ২০১০ সালে দেগঙ্গায় ভয়াবহ হিন্দু নিধন হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় যেসব এফ আই আর হয়েছে সরকার কি সেগুলো একবার খতিয়ে দেখবেন? ওই দাঙ্গার ৫০ খানা ফটো আমার সংগ্রহে আছে। (২) ইদ্রিস মিঁয়া— তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের জন্য কলকাতার ৪টি থানা অঞ্চলে যে সংগ্রাম চালানো হয় যার জন্য সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছে। কয়েকশো কোটি টাকা লোকসান হয়। দোকান ও গাড়ি জ্বালানো হয় নির্বিচারে। পরে নিঃশর্তে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি বসিরহাটের এমপি হন।

(৩) ডাঃ এম গুরবক্স— বিধানসভার হিন্দু সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার জন্য সোচ্চার হয়েছেন, এমনকী তথাগত রায়ের লেখা 'যা ছিল আমার দেশ' নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। এই ডাঃ সাহেব হলেন কুখ্যাত মুসলিম লিগ নেতা হাসানুজ্জমানের সুপুত্র— যে মুসলিম লিগের লেজের আগুনে দেশ ভাগের প্রাক্কালে ২০ লক্ষ নিরীহ ভারতীয় নিহত হয়েছেন, অসংখ্য মাতা ও ভগিনী ধর্ষিতা হয়েছেন।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

কালো টাকা উদ্ধার

ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল সমস্যা প্রয়োজনের তুলনায় অর্থের জোগান কম। তাই এফডিআই-এর মতো ব্যবস্থার প্রয়োগ অবাধ হয়ে পড়েছে। অর্থের ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বহু প্রয়োজনীয় জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনা অর্থের অভাবে বাতিল হয়ে যায়। রাজকোষে ঘাটতির কারণ আয়কর ফাঁকি ও দেশের অর্থ বিদেশে চলে যাওয়া। উন্নত দেশগুলিতে আয়কর ফাঁকির কড়া শাস্তির বিধান থাকলেও ভারতবর্ষের বৃহৎসংখ্যক ধনী ব্যক্তি (যাদের উপার্জন কোটি টাকার বেশি) কর ফাঁকি দিয়ে থাকেন। এছাড়া আর্থিক কেলেঙ্কারি দেশের আর্থিক বিকাশের হারকে রুদ্ধ করে দেয়। ২-জি কেলেঙ্কারি, কয়লা কলেঙ্কারি ইত্যাদি নানা দুর্নীতি ভারতবর্ষের অর্থনীতির প্রগতিকে কয়েকদশক পিছিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষে আর্থিক কেলেঙ্কারি করে পার পেয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের তালিকাও দীর্ঘ। লালুপ্রসাদ যাদব থেকে শুরু করে এ. রাজা, কানিমোঝি প্রভৃতি বহু নাম রয়েছে। এছাড়া সারদা, নারদা, রোজভ্যালি আয়কর আর্থিক জালিয়াতি সংস্থার সংখ্যা প্রচুর। আর্থিক চিটফান্ড সংস্থাগুলির নিষ্ঠুরতায় মাটির কাছাকাছি বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষগুলি জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যেখানে খাদ্য সমস্যা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়-সহ একাধিক অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা অর্থের অভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে দেশের ও দশের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা দেশদ্রোহিতার সমান।

—**প্রণব সূত্রধর,**
আনন্দনগর, আলিপুরদুয়ার।

মুসলমান একতা ও নিদ্রিত জনতা

মুসলমান, মুসলমানই। এদের মধ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ বা বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বলে আলাদা করে ভাবা যায় না। তাই দেখা গেল উচ্চ আদালতের ২৫ জন মুসলমান আইনজীবী জোটবদ্ধ হয়ে ঈদে-দু'দিনের ছুটি আদায় করে নিল। তাহলে দার্জিলিংয়ের মতো জায়গাতে আলাদা ভাষা ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য যদি আলাদা রাজ্যের দাবি উঠে তবে দোষ কোথায়? এ সরকার তো ফি বৎসর জেলা ভেঙে আলাদা জেলা গঠনের উৎসব করে। অপরদিকে আইনজীবী বা শিল্পীদের কতিপয় নামধারী হিন্দু যখন রাস্তায় প্রকাশ্যে গোমাংস খেয়ে (মুসলমানগণ আঘাত পাবে বলে কচ্ছপ মাংস খাননি) নিজেদের হিন্দু সংস্কৃতি ও রুচি বিরোধী বলে প্রমাণ করে, কোটি কোটি হিন্দুর মনে আঘাত দিয়ে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, হিন্দুবিরোধী ও নাদিরশাহের নয়া প্রতিনিধি বলে জানান দেয়। জানি না, এরপর ৫০ শতাংশ মুসলমান হলে, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে একশ্রেণীর মুসলমানরা তাদের আলাদা সংস্কৃতিময় রাজ্য গঠনের দাবি এবং অন্য শ্রেণীর মুসলমানরা কোরান ও কোরবানির অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে সমর্থন করবে। কি-না তা নিদ্রিত হিন্দু সমাজ দেরিতেই জানবে।

কাশ্মীরে মুসলমানদের উগ্রপন্থী তথা আদর্শবাদী হওয়া বা নৃশংস কাজ করা বা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের দৃষ্টিতে দুই বাংলা তো একই বাংলা, কোনো বিভেদ নেই, সেই পূর্ববাংলায় রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় যে হিন্দু নির্মূলীকরণের অভিযান কয়েক দশক ধরে চলছে, তার কোনো প্রতিবাদ মুসলমান সমাজ থেকে পাওয়া গেল না। তাই আজ বিশ্বময় মুসলমান একতা সমান ভাবে অটুট আছে, আর অন্য মতাবলম্বীরা কেউ বা প্রগতিশীল, কেউবা ধর্মনিরপেক্ষ, কেউবা বুদ্ধিজীবী, কেউবা সুশীল সমাজের মাথা হয়ে হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার পথ সুগম করছে। বাংলা বিভাজনের ৭০ বছরে এ এক বড় উপহার। পরের ৭০ বছর আর এই দিবস পালন করার জন্য দেশে কেউ থাকবে না। মুসলিম জাতীয়তাবোধ ও একতা সমগ্র বাংলাকে আগেই শেষ করে দিবে, এ তারই পদধ্বনি।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

বাংলার লোকদেবী সেনেটের বিশালাক্ষী

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

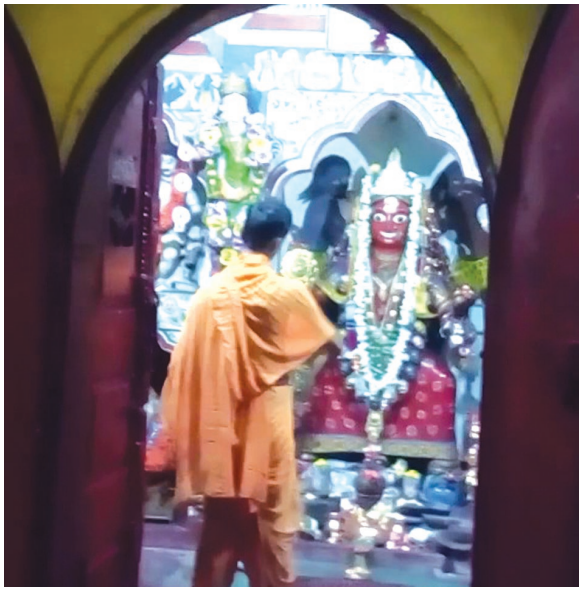

হুগলি জেলার অন্যতম প্রাচীন গ্রাম সেনহাটি, অপভ্রংশে এখন সেনেট। এই গ্রামে কয়েকশো বছর আগে এক শাঁখারি শাঁখা বেচতে গিয়েছিল। বেচতে বেচতে সে গ্রামের বাইরে চলে এসেছে। এবার বাড়ি ফিরবে। সেই সময় এক সুন্দরী ষোড়শী এসে হাজির। সে শাঁখা পরতে চায়। শাঁখা পরার পর শাঁখারি মূল্য চাইলে মেয়েটি বলে, গ্রামের হালদার বাড়িতে যেতে। সে বলে, হালদার কর্তাই তার বাবা, সেই দাম দেবে।

কিন্তু শাঁখারির কথা হালদার কর্তা বুঝতে পারেন না। তখন পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান। পুত্র বা কন্যা কেউ নেই। তাই শাঁখারির কথা বিশ্বাস না করে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন। সেই রাতে হালদার কর্তাকে দেবী ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা রূপে স্বপ্নে দেখা দেন। তিনি জানান, তিনি দেবী বিশালাক্ষী। পুরাণ পুকুরের পাড়ে তিনি শাঁখা পরেছেন। বিশ্বাস না হলে, পুরাণ পুকুরে গেলেই তিনি এর প্রমাণ পাবেন। গ্রামের বাইরে এই পুরাণ পুকুর। বর্তমানে একে দেবীর পুকুর বা মায়ের পুকুরও বলা হয়। সেই পুকুরের পাড়ে গিয়ে হালদার কর্তা দাঁড়াতেই জলতল থেকে একটি শাঁখা-পরা হাত উঠে আসে। হালদার কর্তা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বাড়ি ফেরেন।

এরপর শাস্ত্রজ্ঞদের বিধান নিয়ে বিভিন্ন গাছপালায় সমাচ্ছন্ন পুরাণ পুকুরের একটি পাড় সংস্কার করে দেবী বিশালাক্ষীর ঘট প্রতিষ্ঠা করেন। পরে দেবীর মূর্তি তৈরি করিয়ে পুজো শুরু হয়। হালদার কর্তার মাধ্যমে মৃণ্ময়ী রূপে দেবী প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে সিমেন্টের ঢালাই করে দেবী প্রতিমা নির্মিত হয়। আর সেই সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীও দেবী বিশালাক্ষীর আশেপাশে অধিষ্ঠিত হন।

এক বৃহৎ বিচিত্র সিংহাসনের মধ্যস্থলে দেবী বিশালাক্ষী দণ্ডায়মান। দেবী প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ছ' ফুট। দেবী আক্ষরিক অর্থেই বিশালাক্ষী। বিশাল, আয়ত দুটি চোখ বিস্ফারিত। দ্বিভুজা, নৃমুণ্ডমালিনী, তাঁর বাঁ হাতে রুধির পাত্র আর ডান হাতে উদ্যত খড়্গ। বাঁ পা রেখেছেন কালভৈরবের মাথার উপর আর ডান পা রেখেছেন মহাদেবের বুকের উপর। দেবী সালঙ্কারা, তাঁর নাকে নথ, গলায় হার, মাথায় টিকলি, হাতে শাঁখা, চুড়ি, বাহুতে অঙ্গদ। দুর্গা প্রতিমার মতো দেবী বিশালাক্ষীর পেছনে আছে চালচিত্র, সেখানে রক্তপিপাসু ডাকিনী যোগিনীদের উল্লাসময় মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে।

দেবী বিশালাক্ষীকে ঘিরে তিনটি স্তরে অন্যান্য দেব-দেবীর অবস্থান। তার মধ্যে একেবারে পেছনের স্তরে ডানদিকে বৃষারূঢ় মহাদেব আর বাম ভাগে শ্রীরামচন্দ্র। দ্বিতীয় স্তরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী গণেশ, গণেশের ডানদিকে সর্পভূষণা দেবী মনসা, মনসার পাশে মা কালী। বামদিকে শ্রীরামচন্দ্রের সামনে কার্তিক, কার্তিকের বাঁ পাশে দেবী দিগম্বরী। দিগম্বরীকে নিয়ে মতভেদ আছে। শিবের অপর নাম দিগম্বর, সেই হিসাবে তিনি দিগম্বরী কালী হতে পারেন। কিন্তু কালীমূর্তির সঙ্গে তেমন সাদৃশ্য নেই। তাঁর গায়ের রং অবশ্য কালো, তিনি বিবসনা নন। যদিও তিনি স্বল্পবসনা। তাঁর চোখে করুণ মিনতি, তিনি করজোড়ে দেবী বিশালাক্ষীর উদ্দেশে দণ্ডায়মান। লোকসংস্কৃতির কোনো কোনো গবেষকের মতে, এই দিগম্বরী আসলে অনার্য কন্যা, তিনি কার্তিকের স্ত্রী, কার্তিকেরও আরেক নাম দিগম্বর। অনার্য কন্যা হওয়ায় তিনি পৌরাণিক পরিমণ্ডলে ব্রাত্য। এই জন্য পরিবারের কর্ত্রীর কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তাঁর সংকুচিত অবস্থান। এটা অবশ্য অনুমান। কিন্তু এই অনুমানের মধ্যে সারবত্তা আছে। দেবীর একেবারে পুরোভাগে দু'পাশে জয়া ও বিজয়া— দেবীর দুই সহচরী দণ্ডায়মান। সব মিলে সেনেটের বিশালাক্ষী এক দর্শনীয় প্রতিমা।

লোকবিশ্বাস, দেবীর পুকুরে স্নান করে দেবীর পূজা দিলে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এমনও কথিত আছে, বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র রায় এখানে স্নান করে পূজা দিয়ে ব্যাধিমুক্ত হন। আর সেই কারণে, ১২২৯ বঙ্গাব্দে (১৮২২ খ্রিস্টাব্দে) দেবীর মন্দির নির্মাণ করে দেন। দেবীর প্রতিষ্ঠার একশো বছর পর এই মন্দির নির্মিত হয়। বাংলার নিজস্ব মন্দির নির্মাণশৈলীর নিদর্শন এই মন্দির। দেখলে মনে হয়, দুটি কুঁড়ে ঘরের মতন চালাঘরকে পাশাপাশি যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একে বলে জোড়বাংলা মন্দির। হুগলি জেলায় এই বিশেষ রীতির আরও কয়েকটি মন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৩১ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৩২ ফুট। মন্দিরের সামনের দিকের গায়ে পোড়ামাটির মৃৎফলকে বিভিন্ন দৃশ্য, লতা-পাতা, ফুল, দেবদেবীর মূর্তি অলঙ্কৃত। সামনে নাটমন্দির। টিনের ছাউনি। চারপাশ ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রবেশপথে সুদৃশ্য, সু-উচ্চ তোরণ। ভারী সুন্দর এই তোরণটি অবশ্য পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে। মন্দির চত্বরে বিভিন্ন ফুলের গাছ। একটি শিব মন্দিরও আছে। হালদাররা

দেবীর প্রথম সেবায়েত হলেও এখন দু'ঘর চট্টোপাধ্যায় যুক্ত হয়েছে হালদারদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে।

হালদার ও চট্টোপাধ্যায় মিলিত ভাবে দেবীর নিত্যপূজা করে আসছেন। সাধারণত সাকাল ১১টায় দেবীর পুজা হয়। এছাড়া, দেবীকে ঘিরে নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠান হয়। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে হয় 'জন্মতিথি' উৎসব। প্রচলিত বিশ্বাস, এই তিথিতেই দেবী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন। দুর্গাপূজার সময় বিশেষ পূজা হয়, নবমীতে ছাগ বলি দেওয়া হয়। তবে সবচেয়ে বড়ো উৎসব হয় ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে। এই উৎসবকে 'রান্নাপুজো' বলে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে যেমন 'রান্নাপুজো' হয় এটা সে রকম নয়। এদিন মন্দির চত্বরে কাঠের জ্বালে গ্রামাবাসীরা ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যঞ্জন রান্না করে খায়। প্রথমে কৃষিজীবী সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করলেও এখন অধিকাংশ গ্রামবাসীই অংশ নেয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে, অন্যান্য গ্রামের মানুষও মিলিত হয়। ভক্তরা দেবীর পুকুরে স্নান করে, পুজো দেয়, মানত করে। দেবীর সেবায়েতরা, মৃগীরোগ, বন্ধ্যাত্ব রোগ ও অর্শ রোগের নিরাময়ের জন্য দেবীর ফুলভরা মাদুলি দিয়ে থাকেন। সেনেটের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মা বিশালাক্ষী জাগ্রতদেবী বলেই জনসমাজে প্রচলিত আছে।

পথনির্দেশ : চুঁচুড়া স্টেশন থেকে তারকেশ্বর বা হরিপালগামী বাসে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেনেট বিশালাক্ষী স্টপেজে নামলেই চোখে পড়বে সুদৃশ্য তোরণযুক্ত দেবী বিশালাক্ষীর জোড়বাংলা মন্দির।

উস্‌গালীমলের প্রস্তর ভাস্কর্য

সৌমেন নিয়োগী

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্য প্রস্তর যুগের শিল্পকলার মধ্যে উস্‌গালীমলের ভাস্কর্য এক ঐতিহাসিক স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ গোয়ার সঙ্গুম্ তালুকার অন্তর্গত পীরলা গ্রামে, কুশাবতী নদীর তীরে কঠিন লৌহযুক্ত ল্যাটেরাইট পাথরের উপর খোদিত আনুমানিক একশো চিত্র যাকে Petroglyph বলে। ভারতে কমবেশি কুড়িটি চিত্রিত গুহাআবাস স্থল পাওয়া যায়। যেমন পাঁচমাড়ি, ভীমবেটকা, কেরলের ইড্ডাকাল্ ইত্যাদি। তবে এগুলি প্রত্যেকটিই গ্রানাইট ও বেলে পাথরের উপর চিত্রিত অর্থাৎ Painted. উস্‌গালীমলের বিশেষত্ব হলো যা কঠিন ল্যাটেরাইট পাথরের উপর খোদিত (Carved)। সহস্র বছর পূর্বে আদিম অরণ্যচারী মানুষের ভাব প্রকাশের কারণেই এই প্রস্তর ভাস্কর্যের আবির্ভাব। জৈবিক ও ভৌতিক বিশ্বের কিছু চলমান, কিছু স্থবির ঘটনার এক নাট্যরূপ বিভিন্ন জীবজন্তুর চিত্রে জমাট বেঁধে উন্মোচিত হয়েছে কঠিন প্রস্তরের বুকে। প্রকৃতি এখানে হয়ে উঠেছে নাট্যশালার সংরক্ষক। এএসআই গোয়া অঞ্চলের অধিকারি শ্রী পি.পি. শিরোদকারের মতে উস্‌গালীমলের প্রস্তর ভাস্কর্য Upper Palaeolithic ও Mesolithic মানুষের সৃষ্টি। তারা বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র নির্মাণ করতে জানতো এবং কঠিন ল্যাটেরাইট পাথরে এই ধরনের ভাস্কর্যের জন্য প্রয়োজনীয় তীক্ষ্ণ ও ধারালো যন্ত্র যা স্থানীয় ferroginos পাথরের দ্বারা নির্মিত, ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল। অরণ্য, নদী ও পাহাড় ঘেরা এই অঞ্চল আদিম অরণ্যচারী মানুষের শুধু অন্ন বস্ত্রের উৎস হিসাবে কাজ করেনি, বরং ঐশ্বরীয় মহিমাকে প্রতিফলিত করার জন্য এক অতিরিক্ত সাংকেতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ফলত তাঁরা তাঁদের এই শিল্পকলার মাধ্যমে সেই অদৃশ্য শক্তিকে জানতে চেয়েছে আত্মরক্ষা ও বল বৃদ্ধির জন্য। সম্ভবত সেই কারণেই উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য ও অতীন্দ্রীয় সাংকেতিক চিহ্ন, যা সত্যই রহস্যময় এবং গবেষণার বিষয়।

উস্‌গালীমলের পাথরের উপর বিভিন্ন জীবজন্তুর ও উর্বরতার চিহ্নগুলি শুধু আদিম অরণ্যচারী মানুষের শিকার বা শিকার লব্ধ বস্তুকেই প্রতিভাত করে না, বরং কোনো এক জটিল শক্তিশালী দৃশ্য মাধ্যম যা ঐশ্বরীয় শক্তিকে অনুধাবন করার নিমিত্ত জরুরি তাও এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ ট্রাইস্কেলিয়ন— সাতটি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত সূর্যের প্রতীক বা অংশ ইঙ্গিতসূচক জ্যামিতিক আকারের সুবিন্যাস, যা সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির অতীন্দ্রিয়তার ও মহাজাগতিক উপলব্ধির এক সংযোগ স্থাপন করেছে। এই প্রস্তর খোদিত সাংকেতিক চিহ্নগুলি আদিম অরণ্যচারী শিল্পীর নিছক খামখেয়ালিপনা নয়। জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাবিহীন মানবের অন্তরে উদ্ভাসিত হওয়া প্রথম অভিজ্ঞতার এক সার্থক বহিঃপ্রকাশ, যেখানে প্রকৃতি ছাড়া আর কোনো শক্তিই নেই। প্রকৃতিকে কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করাই সম্ভব।

সার্ধশতবর্ষে কৃষ্ণলাল বসাক

দেবপ্রসাদ মজুমদার

এমন একজন বাঙালিও খুঁজে পাবেন না— তা তিনি বাচ্চা, কিশোর, যুবা, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ— যাই হোন না কেন ব্যায়াম, কুস্তি ও সার্কাস দেখে আনন্দ পান না। এক সময় বাংলাদেশের সর্বত্র এবং শহর কলকাতায় বহু স্থানে ব্যায়াম ও কুস্তির আখড়া ছিল। এখন সে সমস্ত প্রায় লোপ পেয়েছে। ব্যায়াম ও কুস্তিতে এখন আর বাঙালির নাম শোনা যায় না। আগে সার্কাস দেখবার জন্য বাঙালিরা পাগল ছিল, এখন ওই শিল্পেও ভাটা পড়েছে। বাঙালি পরিচালিত সার্কাস দল এখন আর দেখা যায় না। ব্যায়ামে, কুস্তিতে ও সার্কাসে এক সময় বাঙালিদের যে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, আজ তা অস্তমিত। আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতি তা পুনরুদ্ধারেও যত্নশীল নয়। যাইহোক, এত কথা বলবার একটাই কারণ বর্তমান বর্ষ এক বিখ্যাত বঙ্গসন্তান যিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীর এবং সার্কাস-দল প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, তাঁর জন্মের সার্ধশত বৎসর। বিস্মৃতপ্রায় সেই স্বনামধন্য বাঙালি হলেন কৃষ্ণলাল বসাক।

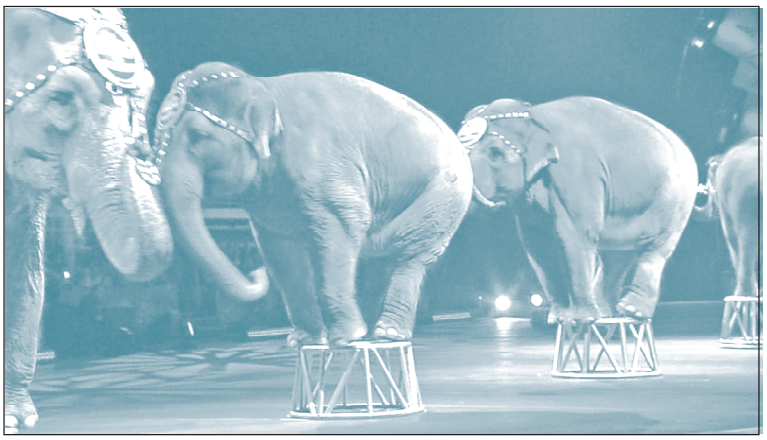

আজ থেকে ১৫০ বছর পূর্বে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল প্রাচীন কলকাতার আহিরিটোলায় কৃষ্ণলাল বসাক জন্মগ্রহণ করেন। বংশ পরিচয়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন বিখ্যাত শোভারাম বসাকের বংশধর। ১৮ শতাব্দীর পলাশির যুদ্ধের সময়ের এক বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার ছিলেন ওই শোভারাম। ইংরাজ বণিকেরা যখন কলকাতা শহর পত্তন করছিলেন তখন শোভারাম ছিলেন তাঁদের অন্যতম সহায়ক। তৎকালে শোভারামদের মতো ধনী ব্যবসাদারদের চেষ্টায় ও আগ্রহেই কলকাতা বন্দর ও নগরী গড়ে উঠেছিল বলা যায়।

মাত্র দু' বছর বয়সে কৃষ্ণলালের পিতৃবিয়োগ হয়। বাল্যকাল থেকেই ব্যায়াম ও দেহশক্তি চর্চা তাঁকে আকৃষ্ট করত। তিনি কলকাতার বিভিন্ন আখড়ায় দেহশক্তিচর্চা শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই জিমন্যাস্টিকসে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ওই সময় শোভাবাজার রাজবাড়ি শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান, গরিমা ও বহু গুণীজনের সমাবেশে মুখর থাকত। শোভাবাজার রাজবাড়িতে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতেরো বছর বয়সে সার্কাস দেখিয়ে কৃষ্ণলাল সকলকে তাক লাগিয়ে দেন ও সকলেই ধন্য ধন্য করতে থাকেন। ওই সতেরো বছর বয়স থেকেই তিনি তৎকালের ইউরোপীয় পরিচালিত বিভিন্ন সার্কাস দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সার্কাসে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হন। এর ফলে বিভিন্ন সার্কাস দলের সঙ্গে ও তাদের আহ্বানে পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন।

এরপর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর তখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে উপস্থিত হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টদের সঙ্গে একই মঞ্চে তাঁর অসাধারণ ও অসামান্য কৌশলসমূহ প্রদর্শন করেন। ওই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি জাগলিং, প্যারালাল বার ডাবল এবং ট্রিপল ট্রাপিজ, ফ্লাইং ট্রাপিজ এবং জাপানি টপ স্পিনিংয়ে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন।

এর অব্যবহিত পরে তিনি নিজে একটি সার্কাস দল গঠন করেন। তৎকালে কোনো বাঙালির পক্ষে সার্কাস দল গঠন ও পরিচালনা খুব একটা সহজ বিষয় ছিল না।

যাইহোক, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সার্কাস দল প্রথমে 'দি গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাস' ও পরে 'হিপোড্রোম সার্কাস' নামে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্কাস দল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। তৎকালে তাঁর সার্কাস দলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় দুই শত ব্যায়ামকুশলী ও কুস্তিগির চাকরি করতেন। এই মহান কর্মবীর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে মাত্র ৬৯ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

অভিনন্দন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল

সুতপা বসাক ভড়

পথ চলতে চলতে এক সময় কে যে কোথায় পৌঁছে যায়, তা ভাবাই যায় না। অনেক সময় চলব বলে চলা শুরু হয়— আর রাস্তা নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যায়। আবার মানসিক দৃঢ়তা থাকলে অনেক পথের মধ্যে নিজের জন্য নির্দিষ্ট ভাললাগার পথটি ধরে চলতে চলতে হঠাৎ নজরে পড়ে— আরে এতটা পথ চলে এসেছি! সাফল্য মনকে খুশিতে ভরিয়ে দেয় এবং আরও এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায়। তবে পরিবার, সমাজ, দেশ যখন সেই পথিকের উৎসাহ বর্ধনের জন্য সদা তৎপর, তখন তাকে কে রুখবে? ঠিক এমনটিই ঘটেছে, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল যখন লর্ডসে বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে যায়, তখন তারা ভাবতেও পারেনি যে, দেশে ফিরে তারা দেশবাসীর কাছ থেকে এত উৎসাহ ভরা ভালবাসা পাবে। জয়ী দলের মতো তাদের স্বদেশে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে।

বিসিসিআই-এর কার্যবাহক অধ্যক্ষ সি.কে. খান্না জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রত্যেক ক্রিকেটারের খুঁটিনাটি সব জেনেছেন। সাপোর্ট স্টাফেদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী দলের মেয়েদের বলেন যে, তাদের মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে, তারা তা জিজ্ঞাসা করতে পারে। এরপর সবাই বিনা সঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় কথাবার্তা বলতে থাকেন। এই সময় তাঁদের মনেই হয়নি যে, তারা দেশের সবথেকে শক্তিশালী মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। সবমিলিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা হবার পরে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

ক্যাপ্টেন মিতালী রাজ, হরমনপ্রীত কৌর, পুনম রাউত, ঝুলন গোস্বামী এবং দলের অন্যান্য সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে জানান। প্রধানমন্ত্রী তাদের বলেন যে, এই প্রথম কোনো দল ফাইনালে উঠে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজের দেশে বিজয়ী দলের মতো স্বাগত জানানো হলো। তাদের এই পরাজয় সত্ত্বেও দেশবাসীরা তাদের মধ্যে জয়ী হবার অপার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। মহিলা দলের একজন সদস্য জানিয়েছেন যে তাদের এই অভিজ্ঞতা— তাদের স্বপ্ন সত্যি হবার আস্বাদন করিয়েছে। তারা অনুভব করতে পেরেছে, তারা কত বড় কাজ করেছে। এর ফলে দেশের মেয়েরা ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলার প্রতি আরও উৎসাহিত হবে।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বক্তব্য দেশবাসীর যে ভালবাসা তারা দেশে ফিরে এসে পেয়েছেন, তা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তাদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে তারা অভিভূত। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বক্তব্য--- মোদীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মহিলা ক্রিকেটাররা জানিয়েছেন যে, এই প্রথম দেশের প্রধানমন্ত্রী, ফাইনালের আগে তাদের জন্য ট্যুইট করেছিলেন। তাতে তারা খুবই আনন্দিত হয়েছেন গৌরবান্বিত হয়েছেন এবং প্রেরণা পেয়েছেন এগিয়ে যাবার জন্য। মহিলা খেলোয়াড়েরা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন যে টেনশন এবং চিন্তামুক্ত থাকার জন্য তিনি কী করেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তিনি যোগ করেন। যোগ তাঁকে মস্তিষ্ক, শরীর এবং তাদের মধ্যে সঠিক সারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সব মিলিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই আলোচনায় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের মধ্যে নব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। মেয়েরা তথাকথিত নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে সফল হচ্ছে এবং আরও এগিয়ে দেশ ও দশের নামোজ্জ্বল করছে--- এটা খুবই আনন্দের কথা। যেসব পরিবারে মেয়েরা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়, তারাও দুচোখ মেলে দেখেছে যে, যুগ পাল্টেছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছানো ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানান দেশের প্রধানমন্ত্রী। ক্রীড়াজগতে মেয়েদের এই অভূতপূর্ব সম্মানে আমাদের কাছে শিক্ষণীয়। খেলাতে মেয়েরা অনেক কৃতিত্ব দেখিয়েছে, আবার দেখাল। আনন্দের কথা হলো, তাদের উৎসাহবর্ধনের জন্য দেশের জনসাধারণের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও তাদের পাশে আছেন।

মাসি তুমিই আমার ফাঁসির কারণ

বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণপরিচয়ের গল্পে মাধব স্বীয় অপকর্মের ফলে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে ফাঁসি যাওয়ার আগে পালিকা মাসির সঙ্গে শেষ ইচ্ছায় সাক্ষাৎ করে। কানে কানে কথা বলার ছলে, মাধব তাঁর কান কামড়ে ধরে বলে, 'মাসি তুমিই আমার ফাঁসির কারণ। দুষ্টকর্মের জন্য যদি তুমি প্রথমেই আমাকে নিষেধ করিতে, তাহা হইলে আজ আমার এমন দশা হইত না।' এখন চারিদিকে সেকুলার মাসিদের হাত কামড়ানো দেখে মাধবের কথাই মনে পড়ে।

স্বাধীনতার পরে ভারতবোধে অটল থেকে সংবিধান-নির্দিষ্ট জাতিধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করলে, আজ আর এই হা হতোস্মির দরকার হোত না। বিশেষ করে কংগ্রেস যেখানে কেন্দ্রে পঞ্চাশ বছর ও সেকুলার সিপিএম বাংলায় রাজত্ব করেছে তিরিশ বছরের ওপর। সেকুলারিজমের নলচে আড়াল দিয়ে যদি তারা ভোট-ভিক্ষার তামাক না খেত, তাহলে ভণ্ডামির মুখোশ খসে পড়ে আজ তাদের এই দশা হোত না। নিরপেক্ষ সেকুলারিজমের গোড়া কেটে আগায় মুসলমান তোষণের জল ঢালার, সেই অ্যাপিজমেন্ট পলিসির মূলে কুঠারাঘাত করেই আজ জাতীয়তাবাদী গেরুয়াবাহিনীর বিপুল জনসমর্থনে দেশব্যাপী এই প্রবল উত্থান। ভাবের ঘরে চুরি না করে শুরু থেকেই যথার্থ সেকুলারিজমের চর্চা করলে আজ এভাবে বিড়ম্বনার শিকার হতে হোত না।

ভারতে মুসলমান অ্যাপিজমেন্টের শুরু সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাপর্বে, গান্ধীজীর হাতে, যখন তিনি অযৌক্তিক ও অবান্তরভাবে খিলাফত আন্দোলনের মতো একটা অলীক ধর্মান্ধ প্রয়াসের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনকে যুক্ত করলেন, এক ধুস্তুরি মায়ায়। এটি গান্ধীজীর এক অস্বীকৃত হিমালয়ান ব্লান্ডার। জিন্নাহ্ সাহেব যখন সরোজিনী নাইডুর কথায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক মূর্ত বিগ্রহ কংগ্রেস নেতা, তখন তিনি গান্ধীজীর রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগের বিরোধিতা করেছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসের মতিলাল নেহরু কমিটি জিন্নাহ্‌র কথাকে কোনওরকম পাত্তা না দেওয়ায়, তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে, অসুস্থ দেহে রাজনীতি ত্যাগ করে বিদেশবাসের সংকল্প নিয়ে লন্ডন গেলেন।

ফিরে এলেন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের ব্রিফ নিয়ে, ব্রিটিশ মদতে কংগ্রেস বিরোধী ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারূপে। গান্ধীজী আগ বাড়িয়ে তাকে স্যালুট জানালেন, কায়েদে আজম বলে। জিন্নাহ্ যে কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের ক্রীড়নক হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমান নেতা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে, খান ওয়ালিখানের প্রামাণ্য Facts Are Facts গ্রন্থে।

গান্ধীজী যথার্থই জাতির জনকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জনজাগরণের জনক; অবহেলিত পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নয়নের সক্রিয় যোদ্ধা; বর্ণবাদী হিন্দু বিভাজনের সর্বনাশা ব্রিটিশ অভিসন্ধির প্রতিরোধে আম্বেদকরের সঙ্গে চুক্তির সফল সম্পাদক; অহিংস অসহযোগ সত্যাগ্রহের সফল রূপকার; সমন্বয়ী ভারতীয় ভাবধারায় চিন্তক, ধারক ও বাহক। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, জাতির প্রয়োজনে, লিগ ও ব্রিটিশ সরকারের যৌথ চক্রান্তের মুখে, তিনি একজন ব্যর্থ পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস্ট। একের পর এক হিমালয়ান ব্লান্ডারেরও জনক। তার ফল জাতীয় জীবনে হয় মারাত্মক। তিনি বুঝতে পারলেন না, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতাপ দেখে লর্ড রিপন সিপাহি বিদ্রোহের পর বলেছিলেন, 'এই ঐক্য ভাঙতে না পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ' এবং তার ফলেই ব্রিটিশের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির সূত্রপাত। শুরু হয় ব্রিটিশ মদতে পলিটিক্যাল ইসলামের উত্থান, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে এক লক্ষ পাউন্ড অনুদান মুসলিম লিগের সৃষ্টিতে। সেই লিগের অধিনায়কত্ব পরে গ্রহণ করলেন পাকিস্তানের প্রবক্তা জিন্নাহ্।

গান্ধীজীর পাহাড়প্রমাণ ভুলের প্রথম পরিচয় যেমন খিলাফত আন্দোলন, তেমনি দ্বিতীয় ব্লান্ডার কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড মেনে নেওয়া যা দেশভাগের ভিত্তি স্থাপন করে। তৃতীয়ত, নতুন স্বায়ত্তশাসন বিল অনুযায়ী প্রথম নির্বাচনে (১৯৩৬) বাংলায় শরৎচন্দ্র বসুকে ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টির সঙ্গে সরকার গঠনের অনুমোদন না দেওয়ায় মুসলিম লিগ সরকারের পথ প্রশস্ত করা। এবং লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ১৯৪৬-এর বীভৎস কলকাতা দাঙ্গার ফলে ভারত বিভাগ সুনিশ্চিত করা। পরবর্তী পরিস্থিতিতে গান্ধীজী, স্বকথিত, 'আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে দেশভাগ হবে', বিস্মৃত হয়ে, কংগ্রেসের দেশভাগের

সিদ্ধান্তে প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স না করে অ্যাকটিভ মৌনং সম্মতিলক্ষণম করেন।

অহিংস উপায়ে নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তপিচ্ছিল পথে, দেশভাগের ফলে, একদিকে পবিত্র ইসলামিস্তান হলেও, অন্যদিকে হিন্দুস্তান করার কোনও গণদাবি ওঠেনি। যদিও হিন্দুস্তান কথাটা ইতিহাসের ধারা বেয়ে আজও জাজ্বল্যমান। এবং হিন্দুপ্রধান ভারত যুগ যুগ ধরে যথার্থ সেকুলার আচরণে অন্যান্য অত্যাচারিত ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয়স্থল হয়েছে। মুসলিম লিগের জঙ্গি ইসলামবাদ সত্ত্বেও ভারতীয় হিন্দুরা যে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি তার প্রমাণ, আই এন এ বাহিনী, যার সেকুলার চরিত্র সম্বন্ধে গান্ধীজী উচ্চকিত হয়েছেন। নেতাজী যেখানে বিরাট বাহিনী নিয়ে সফল হলেন, সেখানে ধার্মিক গান্ধীজী ও তাঁর অধার্মিক মানসপুত্র জওহর এমন ব্যর্থ হলেন কেন।

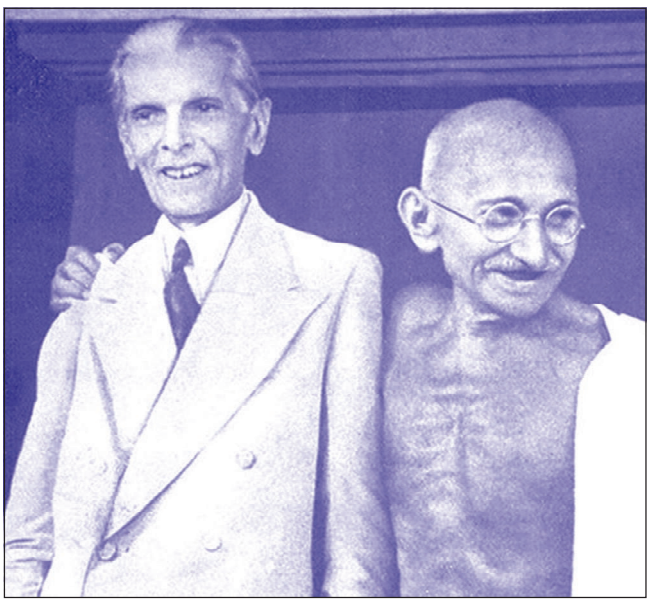

তার কারণ, নেতাজী যথার্থ সেকুলারিজম অনুশীলন করেছেন, আর কংগ্রেসিরা তা নিয়ে মুসলিম অ্যাপিজমেন্টের ব্যর্থ পরিহাসের রাজনীতি করেছেন। তার প্রতিবাদেই মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর বাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি হয়। ফলে হিন্দু মহাসভার নায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নিরলস পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কবল থেকে পশ্চিমবাংলাকে ছিনিয়ে আনায় সফলতা আসে। ভাগ্যের পরিহাসে সেই পশ্চিমবঙ্গই পাকিস্তানি ভাইবেরাদরদের হাত থেকে পূর্ব বাংলার নৃশংস অত্যাচারিত মুসলমানদের মুক্তি যুদ্ধে সংগ্রামীদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বামপন্থীরা তো বরাবর বরের ঘরের পিসি ও কনের ঘরের মাসি হয়ে, ধর্ম না মানলেও ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের থিসিস ঝেড়ে, দেশভাগের জন্যে মরিয়া জিগির তোলে--- লিগ-কংগ্রেস এক হও, দেশভাগ মেনে নাও। একত্ববাদী পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই বহুত্ববাদী সেকুলার ভারত গঠনের জন্য কংগ্রেস-কমিউনিস্ট আঁতাত সোচ্চার হয়ে ওঠে। খুবই উত্তম প্রস্তাব, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশভাগের ফল হলো মুসলমানদের দ্বিমুখী লাভ। একদিকে মেজরিটি মুসলমানের বেহেস্ত পাকিস্তান এবং অন্যদিকে মাইনরিটি মুসলমানদের স্বর্গ গণতান্ত্রিক ভারত। দেশভাগের পরে জিন্নাহ্ ভারতীয় মুসলমানদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ঘাবড়াও মাৎ, এখন চুপচাপ থাকো; গণতান্ত্রিক অধিকারে তোমরাই একদিন নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠবে। নেহরু ও গান্ধী কংগ্রেসের কল্যাণে সেকথা আজ দেশে কেমন সত্য হয়ে উঠেছে।

ফলে একত্ববাদী পাকিস্তান সৃষ্টির পরে বহুত্ববাদী সেকুলার ভারত গঠনের জন্য কংগ্রেস মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে প্রগতিবাদী বামপন্থী 'হিন্দু বাই মিসটেক' মহান নেহরু কেন যে সংবিধান কথিত ইন্ডিয়ান সিভিল কোডের বদলে শুধু হিন্দু কোড বিল করলেন, তা বোঝা খুব সোজা। কেননা তিনি ভারতে জিন্নাহ্কথিত মিনি পাকিস্তানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলেন, যেখানে ভারতীয় আইন-কানুন প্রযোজ্য নয়। কংগ্রেসের সেই অবিমৃষ্যকারী পক্ষপাতদুষ্ট সেকুলারিজমের নমুনা সমানে চলেছে। নেহরুতনয়া ইন্দিরা সেকুলারভাবে হাজি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রকল্পে সরকারি সাহায্য, প্রেসিডেন্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে বশংবদ মুসলমান মুখ তথা মুসলমান-অন্ত প্রাণ রাজনীতি চালিয়ে গেছেন। নাহলে সেই ধারার অনুবর্তী ইউপিএ সরকারের আমলে, যত গুণই থাক, হামিদ আনসারির দুইবার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়ার সৌভাগ্যের অন্য কোনও কারণ নেই।

রাজীব গান্ধী সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠায় আবার একধাপ ওপরে। তিনি ভারতীয় আইনের বিরোধী draconian Law-কে বৈধতাদানের জন্যে সংবিধান সংশোধন করলেন। রাজীবপত্নী সোনিয়াজী আবার মুসলমান সংরক্ষণ ও শিক্ষার নামে জঙ্গি ফান্ডের ব্যবস্থা ও পাকিস্তানি জঙ্গিদের ছাড়পত্র দিয়ে ইসরাত জাহান কেসে ও সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণে হঠাৎ হিন্দু টেরর আমদানি করে বসলেন। এবং ভোটের সময় ইমাম বুখারির দরগায় সিন্নি চড়াতে হাজির হতেন সেকুলার ধর্ম প্রতিষ্ঠায়। আসলে সোনিয়াজী ও তাঁর অনুগত বীরবৃন্দ ভুলে গিয়েছিলেন যে, সেকুলার প্যাঁচের ভাঁওতা দিয়ে কিছুদিন কিছুলোককে ভোলানো যায়, কিন্তু চিরকাল সকল লোককে নয়। মনে রাখা ভালো, নিউটনের তৃতীয় নিয়মটি যে, To every action of secular nonsense, there is an equal and opposite reaction. সুতরাং আজ সেকুলারিজমের ছড়ানো দুধের ওপর বুদ্ধিমন্তদের নাকি সুরে মড়াকান্না নেহাতই হাস্যকর। ■

রোগ উপশমে রসুন

শুভ্রা মল্লিক

মানুষের শরীরে রসুন বিভিন্ন উপকারে আসে। রসুন দুই প্রকার— (১) এককোষী রসুন যার বোটানিক্যাল নাম Allium Sativam (২) বহুকোষী রসুন। তবে এককোষী রসুন বেশি উপকারী।

রসুনে যে সব রোগ সারে : রসুনে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, আয়োডিন এবং উগ্রশক্তির জীবাণুনাশক দুটি শক্তি বর্তমান। ক্যালিফোর্নিয়া শহরে একটি আলোচনা আসর বসেছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের রসুন বিশেষজ্ঞরা। এক একটি দেশ এক একটি বিশেষ রোগের ওপর তাদের যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছিল তা থেকে জানা যায় বিছের ও বোলতার কামড়ে এবং ফোড়ায় রসুন ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া কোষ্ঠবদ্ধতায়, হাতে পায়ে খিল ধরায়, ইনফ্লুয়েঞ্জায়, ধমনীর সংকোচন, সর্দিকাশিতে, হাঁপানিতে, গলাবুক জ্বালায়, অগ্নিমান্দ্যে, অন্ত্রপ্রদাহে, পিত্তথলির পাথুরিতে, হাইব্লাড পেসারে, অর্শরোগে, যকৃৎ দোষে, স্নায়বিক দুর্বলতায়, গলক্ষতে ফেরিনজাইটিসে, ডিপথেরিয়ায়, নানা প্রকার চর্ম রোগে, ক্ষয় রোগে, গলগণ্ডে, ক্রিমিতে, হুপিং কাশিতে, বমিতে, বুক ধড়ফড়ানিতে রসুনের ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কীভাবে রসুন খাবেন? (১) তেলে বা ঘিয়ে ভেজে শাক বা তরকারির সঙ্গে খেতে পারেন। (২) আটা বা ময়দার ভিতর রসুন বেটে দিয়ে তার রুটি বা লুচি তৈরি করে খেতে পারেন। (৩) ছাতুর সঙ্গে রসুন বেটে খেতে পারেন। (৪) গরম দুধে মিশিয়ে রসুন বাটা খেতে পারেন। (৫) কাঁচা রসুন বা রসুন সেদ্ধ করে ভাতের প্রথম গ্রাসের সঙ্গে খেতে পারেন।

কীভাবে রসুনের দুর্গন্ধ দূর করবেন? রাতে রসুনের খোসা ছাড়িয়ে তা টুকরো টুকরো করে দইয়ের ভিতর রেখে দিন। পরদিন খাবার আগে তা জলে ধুয়ে খাবেন তাতে গন্ধ থাকবে না আবার খাদ্যগুণও বজায় থাকবে।

এর ব্যবহারগুলি নিম্নরূপ—

(১) যৌবনশক্তি দীর্ঘস্থায়ী করতে : প্রতিদিন নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে যদি দু-চামচ

আমলকির রসের সঙ্গে ২ কোয়া রসুন বেটে খান তবে যৌবনশক্তি বৃদ্ধি হবে।

(২) বাতের বেদনায় : রোজ ১ কোয়া করে রসুন গরম ভাতের সঙ্গে চিবিয়ে খেলে বা ১০০ গ্রাম তেলে ১০ কোয়া রসুন ভেজে সেই তেল দিয়ে দুবার করে মালিশ করলে ব্যথা কমে।

(৩) পেটের বায়ুতে : ১ কাপ ঠাণ্ডা জলে ৪-৫ ফোঁটা রসুনের রস মিশিয়ে রোজ সকালে খেলে ৭ দিনে পেটের বায়ু জমা বন্ধ হবে।

(৪) অকাল বার্ধক্য রোধে : রোজ ৪ কোয়া করে রসুন ভেজে বা বেটে তরকারি বা আটা, ময়দার ছাতুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে অকাল বার্ধক্য দূর হবে।

(৫) দেহের ক্ষয়ে : ১ কাপ দুধের সঙ্গে ২-৩ কোয়া রসুন সেদ্ধ করে মিশিয়ে রোজ খেলে শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায় ও ক্ষয় রোধ হয়।

(৬) গোরু-মোষের ঘা সারাতে : ৮-১০ কোয়া রসুন বেটে ক্ষতের জায়গায় লাগালে ঘা শুকিয়ে যাবে। অন্তত ৭ দিন লাগাতে হবে।

(৭) পায়ের ঘা বা ক্ষততে : ৪-৫ কোয়া রসুন বেটে ক্ষততে লাগালে ৭ দিনে ঘা সেরে যাবে।

(৮) পুরানো ঘা বা গুফোতে : ১ কোয়া রসুন দু-টুকরো করে ১ টুকরো কড়ার ওপর লাগিয়ে লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে আটকে দিন। ৩ দিন এরূপ করলে রোগ নিরাময় হবে।

(৯) শুক্র তারল্যে : ১ কাপ গরম দুধের সঙ্গে ২-৩ কোয়া রসুন সেদ্ধ করে মিশিয়ে খেলে শুক্র তারল্য হবে না। হাড়ের বল বাড়বে, ক্ষয় রোধ হবে।

(১০) মদ খাওয়ার জন্য পেট ব্যথা হলে : মদ খাওয়ার জন্য ২ কোয়া করে রসুন রোজ খেলে মদ খাওয়ার অভ্যাসই চলে যাবে।

(১১) মাথা ধরা : মাথা ধরায় দু-এক ফোঁটা রসুনের রস নস্যির মতো নাকে টানলে মাথা ধরা সারবে।

(১২) এমফাইসিসা : এটি এক ধরনের হাঁপানি রোগ। এতে রোগীর নিঃশ্বাস ছাড়তে কষ্ট হয়। এরূপ হলে ৫-৬ ফোঁটা রসুনের রস দুধ জ্বাল দিয়ে ঠাণ্ডা করে তার সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার হয়।

(১৩) টিবি প্রতিরোধে : রোজ যদি ১ কোয়া করে রসুন বাটা গরম দুধের সঙ্গে খাওয়া যায় তবে টিবি নিরাময় হবে।

(১৪) পুরাতন জ্বরে : জ্বর হচ্ছে তা কমছে বাড়ছে কিন্তু একেবারে বন্ধ হচ্ছে না —এরূপ হলে ৫-৬ ফোঁটা রসুনের রস ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ৩-৪ দিন খান জ্বর ছেড়ে যাবে।

(১৫) রোগা শিশুদের জন্য : অনেক শিশু আছে তারা ভালো মন্দ খাচ্ছে কিন্তু তাতে স্বাস্থ্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এরূপ ক্ষেত্রে আধ কোয়া রসুন ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শিশুর পুষ্টি হবে।

(১৬) আর্টারি ও স্কেলেরোসিস : বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম ধমনির স্থিতিস্থাপকতা কমে যাওয়ায় রক্তে চাপ বাড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে রোজ ১ কোয়া করে রসুন ভাতের পাতে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

(১৭) কুকুরে কামড়ালে : রোজ ৫-৬ ফোঁটা রসুনের রস গরম দুধে মিশিয়ে খেলে কুকুরের কামড়ানোর বিষ নাশ হয়।

জীবনের বাঁক বদলের যুদ্ধে অবিসংবাদী নায়ক প্রমোদ গৌতম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের বিপুলসংখ্যক বাবার মতো প্রমোদ গৌতমের বাবাও চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হোক। নয়তো ডাক্তার। বাবার ইচ্ছা পূরণ করেছিল ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর যথেষ্ট ভালো চাকরি পেয়েছিলেন প্রমোদ। কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ছেড়েছুড়ে তিনি কৃষক হয়ে গেলেন। শুধু হলেনই না, সফলও হলেন। এখন তার রোজগার বহু চাকুরেকে লজ্জা দেবে।

প্রমোদের জন্ম নাগপুরে। যদিও ছেলেবেলার একটা বড়ো অংশ কেটেছে পৈতৃক গ্রাম ওয়াধনায়। সেখানে বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করার স্মৃতি এখনও প্রমোদের মনে সজীব। কিন্তু বাবার দেখাদেখি কখনও চাষি হবার কথা ঘুনাক্ষরেও ভেবেছিলেন কিনা সেটা আর মনে পড়ে না।

পড়াশোনায় ভালো ছিলেন প্রমোদ। তাই স্কুল কলেজের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার হতে অসুবিধে হয়নি। তারপর মোটা মাইনের চাকরি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন চাকরি করা তার পোষাবে না। শুরু করলেন গাড়ির যন্ত্রপাতির ব্যবসা। তাও চলল না। ২০০৬ সালে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে আর নয়। পারিবারিক সূত্রে ২৬ একর জমি পেয়েছিলেন। পরিবারে কৃষির একটা পরম্পরাও ছিল। সুতরাং কৃষিকাজই তার ভবিতব্য। প্রমোদ বলেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করলেও কোনওদিনই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। আমি বরং চাইতাম চাষাবাদ করতে। যদিও জানতাম তার জন্য আমায় প্রায় দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হবে।'

কৃষকজীবনের শুরুটা নানা ঝড়ঝাপটায় কেটেছে। প্রমোদ বাদাম আর হলুদ চাষ দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সেই সময় কৃষিশ্রমিক পাওয়া ছিল মস্ত বড়ো সমস্যা। রুজিরুটির ধান্ধায় সবাই শহরে পাড়ি দিলে কাজ করার লোক কোথা থেকে আসবে! আর একটা সমস্যা, ইঞ্জিনিয়ার থেকে চাষি হওয়ার জন্য আত্মীয়-পরিজনদের টিটকিরি।

২০০৭-০৮ সাল নাগাদ প্রমোদ সনাতন কৃষিপদ্ধতিতে বিদায় করে ঠিক করলেন ফল চাষ করবেন। শুরু হলো কমলালেবু, পেয়ারা, লেবু, মুসম্বি আর কলার চাষ। প্রমোদ বলেন, 'ফলচাষের সুবিধে হলো এতে শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করতে হয় না। বীজ রোয়ার পর তুলো বা সোয়াবিনের ক্ষেত্রে যেমন অতিরিক্ত যত্ন নিতে হয়, ফলচাষে তার দরকার নেই। এছাড়া নানা সরকারি স্কিমেরও সুবিধা নেওয়া যেতে পারে।'

এই সময় প্রমোদ ফলের পাশাপাশি মটরশুঁটি এবং ডাল চাষও শুরু করেন। এবং একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা তার নজরে আসে। তিনি লক্ষ্য করেন, চাষিরা কমদামে মটরশুঁটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মিলগুলিতে বিক্রি করে। মিলমালিক প্রক্রিয়াকরণের পর ওই মটরশুঁটি এবং ডাল চড়া দামে চাষিদের বিক্রি করে দেয়। এইসব মিল কৃষিক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে। যাতায়াতে সময় ও অর্থব্যয় হয়। অর্থাৎ চাষিদের লাভের গুড় পিপড়েয় খেয়ে যায়। প্রমোদের মনে হলো তিনি যদি মিল খোলেন তাহলে চাষিদের আর দূরে যেতে হয় না। কিন্তু টাকা পাবেন কোথায়? একটা মিল খুলতে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। তার কাছে আছে মাত্র এক লক্ষ। দমে না গিয়ে তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেন এবং তার নিজের প্রক্রিয়াকরণের মিল ভূমিষ্ঠ হয়। এখন তিনি এক কেজি ডাল পলিশ করতে সাড়ে চারটাকা নেন। সেই সঙ্গে প্রতি কুইন্ট্যালে ৬৫ কেজি পলিশ করা ডাল চাষিদের দেন বিনামূল্যে। আশেপাশের ৩৫টি গ্রামের ২,৫০০ কৃষক তার সঙ্গে ব্যবসা করে। প্রক্রিয়াকরণের ব্যবসায় তার বার্ষিক আয় ১ কোটি টাকা আর ফলচাষে ১০-১২ লক্ষ। তাই অনায়াসে তিনি যে-কোনও মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'একই সঙ্গে নিজের এবং মানুষের ভালো করার এমন সুযোগ চাকরি করে কি পেতাম? চাকরি ছেড়ে আমি কোনও ভুল করিনি।'

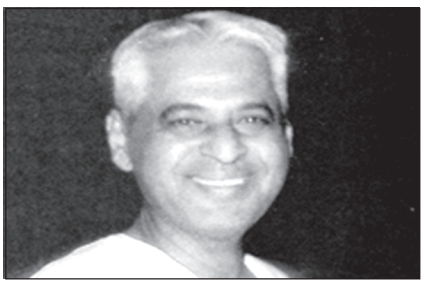

লক্ষ্মণরাও ইনামদারজীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রী লক্ষ্মণরাও ইনামদারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। শ্রীইনামদারজীকে মহান প্রেরণাপুঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি তাঁর প্রতি অপার শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন।

শ্রী লক্ষ্মণরাও ইনামদারজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সহকার ভারতী 'সহকার সংদর্শিকা-২০১৭' স্মরণিকা প্রকাশ করছে। এই স্মরণিকার জন্য প্রেরিত এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীলক্ষ্মণরাও ইনামদারজীর জীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে ব্যক্ত করেছেন। এই বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন— ''তিনি এক সেতুস্বরূপ ছিলেন। শত শত কার্যকর্তাকে যুক্ত করার সেতু। হাজার হৃদয়কে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের সেতু। নিরন্তর সংস্কার গ্রহণের এক মাধ্যম। একজন যোজক হিসাবে তিনি সংগঠন ও স্বয়ংসেবকদের যে নতুন দিশা দেখিয়েছেন, তার জন্য সংগঠন ও হাজার হাজার স্বয়ংসেবক তাঁর কাছে ঋণী।''

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ''এই মহান বিভূতির প্রতি আমার হৃদয়ে যে অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে, তা প্রায়ই একান্তে অনুভব করি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা আপনিই নত হয়ে যায়, প্রতি মুহূর্তেই মনে মনে তাঁকে বন্দনা করি, শ্রদ্ধা জানাই।

এই প্রথম ইনামদারজী প্রতি প্রধানমন্ত্রী নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এমন নয়। নিজের লেখা 'সেতুবন্ধ' ও 'জ্যোতিপুঞ্জ' গ্রন্থেও শ্রী লক্ষ্মণরাও ইনামদারের জীবন ও ব্যক্তিত্বের কথা প্রকাশ করেছেন।

(PMO-র সৌজন্যে)

শিকাগোতে বিবেকানন্দ

স্বামীজী পায়ে হেঁটে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। এবার তিনি যাবেন বিদেশে, আমেরিকার শিকাগোতে। বিশ্ব ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দিতে। ১৮৯৩ সালের ৩১ মে মুম্বাই থেকে জাহাজে করে তিনি সমুদ্রযাত্রা শুরু করলেন। স্বামীজী জাহাজ থেকে চারিদিকে চেয়ে দেখেন,

শুধু জল আর জল। জাহাজটি বিভিন্ন বন্দরে থামতে থামতে যাচ্ছে। সিংহল, সিঙ্গাপুর, জাপান। অবশেষে তিনি একদিন আমেরিকাতে গিয়ে পৌঁছালেন।

নতুন দেশ, বিবেকানন্দ কিছুই চেনেন না। পরিচিত কেউ নেই। কয়েকদিন থাকার পর তিনি গেলেন ধর্ম সম্মেলনের খোঁজ নিতে। গিয়ে শুনলেন ধর্ম সম্মেলন শুরু হতে এখনো অনেক দেরি। শুধু তাই নয়, ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র দরকার। স্বামীজী ভীষণ বিপদে পড়লেন। এখানে তাঁর কোনো থাকার জায়গা নেই, কোনো পরিচয়পত্রও নেই। শিকাগোতে আসার সময় বোষ্টনের এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয়েছিল। নাম মিস স্যানবর্ণ। স্বামীজীকে তিনি তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীজীর সেই কথা মনে পড়ে গেল। তখন তিনি বোষ্টনে সেই স্যানবর্ণের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু পরিচয়পত্র পাবেন কোথায়? পরিচয়পত্র না থাকলে যে ধর্মসভায় যোগ দিতে পারবেন না। এই সমস্যার কথা শুনে সেখানকার অধ্যাপক হেনরি রাইট ধর্মসম্মেলনের এক কর্তাকে চিঠি লিখলেন এবং সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এমনকী শিকাগো যাওয়ার টিকিট পর্যন্ত তিনি কেটে দিলেন।

কিন্তু শিকাগোতে এসে স্বামীজী আর এক বিপদে পড়লেন। অধ্যাপক হেনরি ধর্মসম্মেলনে আয়োজকের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন স্বামীজী তা হারিয়ে ফেলেছেন। সেবারও সাহায্যে এগিয়ে এলেন স্বামীজীর গুণমুগ্ধ এক মহিলা। সেই মহিলার চেষ্টায় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অনুমতি পেলেন তিনি।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, বিশ্ব ধর্মসম্মেলন শুরু হলো। শিকাগোর কলম্বাস হলে সেই অনুষ্ঠান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন। তাদের সঙ্গে স্বামীজী মঞ্চের প্রথম সারিতে বসে আছেন। একে একে সবাই বলছেন। তারপর এলো স্বামীজীর পালা। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করলেন। বিশাল শ্রোতামণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন— আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইয়েরা। স্বামীজীর এই কথাতে করতালিতে ভরে উঠলো সভাকক্ষ। বক্তব্য রাখার জন্য স্বামীজী খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দুধর্মের মূল কথাগুলিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন তিনি। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন বিশ্বের মধ্যে হিন্দুধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। উপস্থিত সকল বক্তা কেবল তাদের নিজের ধর্মের কথাই বলে গেছেন, কিন্তু স্বামীজী বললেন সব ধর্মই সত্য। হিন্দুরা সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করে। এই ভাষণের পর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সেখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো তাঁর নাম। এভাবেই বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মহানতার কথা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে আমাদের ধর্মকে বিশ্বজনীন করে তুলেছেন।

ভারতের পথে পথে

পুরী

পুরী ভারতের প্রাচীনতম একটি নগরী। জগন্নাথদেবের অবস্থান এই নগরীতে। প্রতি বছর এখানে অনুষ্ঠিত রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী উপস্থিত হয়। আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চার মঠের একটি এখানে রয়েছে। পুরীর জগন্নাথদেবের বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। এছাড়াও বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের কাছেও পুরী অত্যন্ত শ্রদ্ধার কেন্দ্র। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব বহুদিন সেখানে অবস্থান করেছেন। এবং সেখানেই তাঁর লীলা সাঙ্গ করেছেন। পুরী বর্তমানে ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্গত। সমুদ্রের তীরে অবস্থান হওয়ার কারণে পর্যটকদের কাছেও পুরী খুব আকর্ষণীয়।

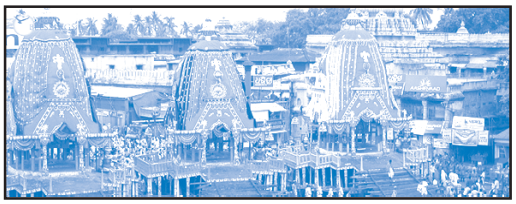

এসো সংস্কৃত শিখি

তর্হি সর্ব দায়িত্বং ভবত: এব।
তাহলে সব দায়িত্ব তোমারই।
সর্বত্র অগ্রে সরতি।
সে সব জায়গায় আগে থাকে।
ভবন্তং গৃহে এব দ্রক্ষ্যামি।
তোমাকে বাড়িতেই দেখব।
স: নিষ্ঠাবান্।
তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান।
দ্বয়ো: একঃ আগচ্ছতু।
দুজনের একজন এসো।

ভালো কথা

পুরানো বইয়ের যত্ন

জ্ঞানের উৎস হলো বই। তাই বইয়ের যত্ন করা উচিত। আমাদের পুরানো আলমারিতে রাশি রাশি বই সাজানো আছে। যেগুলোর অনেকগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার মুখে। বইগুলি আমার ঠাকুর্দার। কিন্তু এখন সেগুলি কেউ খুলেও দেখে না। আমি কৌতূলহলবশত আলমারি খুলে দেখি বইগুলির খুব খারাপ অবস্থা। কোনটা ছিঁড়ে গেছে, পোকায় নষ্ট করে দিয়েছে। যে বইগুলি বাইন্ডিং করে ভালো করা সম্ভব তার কয়েকটি বই বেছে নিয়ে বাইন্ডিং করতে দিলাম। ইচ্ছে আছে ধীরে ধীরে সমস্ত বইকে বাইন্ডিং করে সংগ্রহ করার।

শুভাশিস বর্মা, জোড়াই মোড়, কোচবিহার।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

মাতৃভাষা

অভিদীপ মিত্র, ষষ্ঠ শ্রেণী, মালদা

ভুলো না যেন বাংলা ভাষা
ভুলো না দেশ মোটে
মাতৃভাষা ভুলে গেলে
কথা কী আর ফোটে?
যেও না ভুলে শোনো বলি
মোদের প্রিয় বাংলা ভাষা
জন্ম হলে কাঁদতে গিয়ে বলি যে মা
সেও তো মোদের বঙ্গভাষা।

মাম্মি বলো, মম বলো
প্রথম শব্দ মা
এ ভাষা মাতৃভাষা
তুচ্ছ কোরো না
কথা বলুক ইংরেজিতে
বলুক নিজের ভাষা
সবার চেয়ে মিষ্টি জেনো
আমার বাংলা ভাষা।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৪

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো শারদীয়া

দেবী প্রসঙ্গ : ড. সীতানাথ গোস্বামী

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - বিপরিণাম
সুমিত্রা ঘোষ - চিরন্তন কাহিনি

ইতিহাসের আলোয় উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - সম্ভবামি

গল্প

এষা দে, শেখর বসু, রমানাথ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
সন্দীপ চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, বিরাজনারায়ণ রায়

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক

প্রবন্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, এম জি বৈদ্য,
স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, অমলেশ মিশ্র, দেবীপ্রসাদ রায়, সৌমেন নিয়োগী,
রবিরঞ্জন সেন, রজত পাল, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ

পুরাণ কথা

বিজয় আঢ্য

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
4 September - 2017 - Rs. 10.00,
Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।